শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। এই বিশ্বই আমার মহামঠ'
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়"।

'আমি বিশ্ব-নাগরিক'

CALCUTTA

সম্পাদিকা—বেণু মিত্র ৩১ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

UJJWAL BHARAT

from—IV

See Rule 8

		Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, Calcutta-56 West Bengal
	Periodicity of its Publication	Bi-monthly
	Printer's Name	Bimal Kumar Chakravarty
	Nationality	Indian
	Address	Rabindra Pallee P. O. Jangra, 24 Pargs.
4.	Publisher's Name	Bimal Kumar Chakravarty
	Nationality	Indian
	Address	Rabindra Pallee P. O. Jangra, 24 Pargs
5.	Editor's Name	Renu Mitra M. A.
	Nationality	Indian
	Address	Naranarayan Ashram P. O. Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total Capitial.	Naranarayan Ashram P. O. Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal

I. **Bimal Kumar Chakravarty**, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. **Bimal Kumar Chakravarty**

Signature of Publisher

১৮৬ বৈশাখ, খ্রী ১৯৭৯

লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জ্বলভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে-অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অভ্যুদয়—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে। —স.—উঃ ভাঃ।]

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'লাঙ্গল'-চক্র ও চক্রী 'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষ প্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে, পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের ধ্বংসঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজত্বটি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসংবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে কৃষ্টি 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

আমাদের কথা

'উজ্জলভারত' পত্রিকা পৌষ ১৩৮৪-তে তাহার অস্তিত্বের ত্রিশ বৎসর শেষ করিল। ইহা ক্ষীণ-কলেবর বটে তবু উজ্জলভারতের মত একটী পত্রিকার বর্তমান দেশ কালের পরিবেশে ত্রিশ বৎসর একটানা টিকিয়া থাকাটাই এক দিক দিয়া গৌরব-জনক বৈকি। তাই ইহার ক্ষীণ-কলেবরত্ব বেদনা ও লজ্জার কারণ হইলেও এই একটানা ত্রিশ বৎসরের টিকিয়া থাকাটা উজ্জলভারতের মত পত্রিকার পক্ষে আনন্দ-সংবাদ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে কথাটা সে বলিতে চাহিতেছে সে কথাটা ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন খুবই নূতন শুনাইত—কেননা প্রত্যেকের উপলব্ধিকেই যথাস্থান ও যথামান দিয়া সবলকে মিলাইয়া একটী জীবন্ত সামগ্রিক জীবন-চেতনার কথাটা শুনিতে বা ভাবিতে মানুষ অভ্যস্ত ছিল না। অভ্যস্ত ছিল না বলিয়াই উজ্জলভারতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল যখন প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই সামগ্রিক জীবনতত্ত্বের বৈপ্লবিক সূত্রগুলি তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিলেন, তখনও তিনি স্বয়ংও ঐ সমস্ত বিরাট পরিবর্তনসূচক কথাগুলি খুব কমই মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে তাহার প্রয়োজন মানুষের মধ্যে দেখা দিবে জানিতেন বলিয়া সেগুলি প্রকাশ করিতে ও রক্ষা করিতে নানা ব্যবস্থা করিয়াগিয়াছিলেন। এই চিন্তাধারা যাহা রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, আজ তাহা অংশে অংশে অনেকেরই কথা। উজ্জলভারত-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই অনেকের অংশে অংশে ছড়ানো কথাগুলিকে গুছাইয়া একটী পূর্ণাঙ্গ দর্শনের রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। একের সত্তা উপলব্ধির সঙ্গে অপর সত্তা উপলব্ধি-গুলিকেও সমন্বিত করিয়া, একটি সামগ্রিক জীবন দর্শনের যে সুন্দর স্বাভাবিক সুস্থতা—যেখানে কাহাকেও নিরাকরণ করিতে হয় না—সেই সুস্থতার কথাই আছে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত ভারতীয় প্রস্থান ত্রয়ের ভাষ্যগুলিতে। উজ্জলভারত জীবনের এই সুস্থতার কথা ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের প্রতি স্তরে ছড়াইয়া দিতে চাহিতেছে—যাহাতে প্রতিটি মানুষ কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেমের সমন্বয়ে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবা-বুদ্ধিতে জীবনকে পোষণধর্মী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। এই পোষণধর্মী সামগ্রিক জীবনের সুস্থতা শ্রীশ্রীনিতাগোপালের জীবনে প্রকাশিত। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও জীবনে গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় শ্রীনিতাগোপাল সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'প্রকাশক্ষেত্র তাঁহার বিশ্বের প্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণস্তরে। তিনি কোন বিশেষ মতবাদের নন, বিশেষ কোন জাতির নন। তাঁহার জীবনে সর্ব দর্শন সর্ব মতবাদ সর্ব গুণ, সর্ব কর্ম, সর্ব জাতি হাত ধরাধরি করিয়া অন্যোন্যমিলনের ভিতর দিয়া এক রাসচক্র

গড়িয়া তুলিবে। তাই তিনি শ্রীমুখে বলিতেন, 'I am a cosmopolitan'। তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে নরত্ব ও নারায়ণত্বের সমন্বয়ে; তাই তিনি নর-নারায়ণ। নরের দাবী ও নারায়ণের দাবীর স্বয়ংমূল্য দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে সৃষ্টি করিবার যোগ (কৈশল) তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন....।' তিনি ঐ পুস্তকেরই ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, 'মার্কসের সমস্ত দর্শন স্ফুরিত হইয়াছে জড়াশ্রয়ে, সেখানে চৈতন্যের স্থান গৌণ, জড়েরই creation হইতেছে চৈতন্য; পক্ষান্তরে হেগেলের দর্শনে চৈতন্যই মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে; জড় সেখানে গৌণ। হেগেল-মার্কসের এই দ্বন্দ্ব কে মীমাংসা করিবে শ্রীনিতাগোপাল বাতীত যিনি জড়-দর্শন ও অজড় দর্শনকে সমমূল্যে গৌরবান্বিত করিয়া পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-সঙ্ঘ রচনার এক অভিনব কৌশলের খোঁজ দিয়া গিয়াছেন?' এই সমস্ত কথাই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর উজ্জলভারত পত্রিকা চিন্তাশীলদের নিকট উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। একটা সামগ্রিক বিপ্লবের এই যে চিন্তাধারা ইহা ব্যক্তি ও সমষ্টির সমস্ত স্তরে আমূল পরিবর্তন আনিতে চাহিতেছে বলিয়াই মানুষের কাছে আজও দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। এই চিন্তাধারা যে কত সুদূর-প্রসারী ও গভীর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় তাহা আরও একটু উল্লেখ করি। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনের ১০৬ পৃষ্ঠায় জীবনের গভীরতম একটী সমস্যা উপস্থিত করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন, "সত্যই রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিশ্বের বুকে প্রবর্তিত না হইলে কেন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী, দেবদেবী কামের আকর্ষণে এমন উন্মাদের মত ছুটিয়াছে, এই উন্মাদনার মূলে ভগবদাস্বাদন নিহিত রহিয়াছে কি না, ইহার কোনও পারমার্থিক মূল্য আছে কি না, তাহা কি কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত? মদনের যে একটী ভাগবত রূপ রহিয়াছে এবং জীবজগতের মনস্তরে স্বরূপগত এই ভাগবত কাম অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই যে সে ইহাকে আস্বাদন করিবার জন্য বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ-বিনের অপ্রাকৃত এই নবীন মদনের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত যে কামের পরমার্থ রূপ উদ্ভাসিত হইবে না, এবং এই পরমার্থ রূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিলেও যে সে নিগৃহীত হইবে না, কালের সুযোগ পাইলেই যে সে আবার অধিকতর প্রতিহিংসা লইয়া সাধককে বিব্রত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আজ বিশ্বের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। মদনের পরমার্থ রূপ না বুঝিবার জন্য ও তাহাকে চাপা দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ মদনানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাহার সূচনা আজ বিশ্বময় সর্বত্র। এই মদনানলকে নির্বাপিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল শ্রীগৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হওয়ার। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া আসিয়াছিলেন যুগযুগান্তের নিগৃহীত (repressed) কামকে বিশ্ব সভ্যতার উপযোগীরূপে প্রবর্তন করিয়া বিশ্বকে সুস্থ করিবার এবং শোষণহীন বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়া।" সৃষ্টির গোড়ার প্রেরণা এই কাম যে in-itself হেয় নয়, কুৎসিৎ নয়, ইহা ব্যবহারের ছন্দ না জানার জন্যই যে ইহা ব্যক্তি-সমষ্টি-জীবনে অকল্যাণকে জন্ম দেয়, তাহাদের

ধ্বংস আনয়ন করে, ইহার অন্তর্নিহিত কল্যাণ-রূপকে যে উন্মোচিত করা যায়—এই সমস্ত কথাই উজ্জলভারত বলিতে চাহিতেছে। তাই তাহার পথ পরিক্রমা কঠিন। তাই তাহার চারিদিকে অনেক লোক ভিড় জমাইতে পারে না। তাই ক্ষীণকায় হইয়াও সে তাহার ব্রত লইয়া চলিতেছে এবং চলিবে। এই আশা ও সংকল্প লইয়া উজ্জলভারত আবার নূতন বৎসরে রওয়ানা হইল। যাহারা ইহাকে তাহার চলার পথে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন, আজও তাঁহাদের কাছে অধিকতর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। চলার পথে নূতন লোকের সাহায্য ও সহযোগিতাও নিশ্চয় পাইব—নহিলে এত পথ আসা কি সম্ভব হইত? দূরে কাছের, জানা অজানা সর্ব সাধারণের সহযোগিতা কামনা করিয়া, উজ্জলভারতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিতাগোপালকে ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে সর্বাঙ্গীণ প্রণতি জানাইয়া উজ্জলভারত রওয়ানা হইল—খণ্ড ছিন্ন 'অহং প্রথমঃ' মতবাদ বা আচার আচরণের দ্বারা বিপর্যস্ত বিশ্ব-মানসিকতার সম্মুখে অখণ্ড, সমগ্র, সকলের হাত ধরাধরিতে রাস-চক্র-রচনা-কারী জীবন ও চিন্তাধারা লইয়া। জয় হউক সর্ব দেশের সর্ব কালের সকল মানুষের, জয় হউক কাহাকেও নিরাকরণ করিতে চাহেন না যাহারা সেই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৬

ওঁ নমঃ পুরুষোত্তমায় শ্রীনিতাগোপালায়।

ঠাকুর, আমার মন বুদ্ধি তোমাতে লয় করিয়া তোমার স্তরে উঠিয়া, তোময় হইয়া আমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-প্রকৃতি সব পাইব। তখন উহারা বিশ্ব-মন, বিশ্ববুদ্ধি বিশ্বপ্রাণ প্রভৃতিরূপে রূপায়িত হইবে। দেহ-প্রাণাদির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তো পরকীয়। আমি তোময় হইয়া বিশ্বদেহী হইব, কিম্বা বিশ্বদেহী হইতে হইতে তোমার স্তরে তুমিময় হইব দুই দিক হইতেই তোমাকে বুঝিতে ও পাইতে হইবে। আমার কাছে যখন দৃশ্য দেহপ্রাণমন অন্যান্য বিশ্বের দেহের সঙ্গে দৃশ্য হইবে, মিলিত হইবে, তখনই আত্মা ও দেহ, দ্রষ্টা-দৃশ্য এক হইবে, সর্ব দেহকে আত্মা পরিপাক করিতে পারিবে। এই ভাবে সর্ব আবেষ্টনকে পরিপাক করিবার মত দীপ্তাগ্নি আমাকে দেও, ঠাকুর। সব কিছুকে নেতি নেতি করিয়া অথচ সব কিছুকে স্বীকার করিয়া আমি অনন্ত তোমাকে অনন্ত কাল ধরিয়া পাইব। 'যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'—সর্ব যেন আমায় পরাস্ত করিতে না পারে তুমি তাহা কর। তুমি যেমন অনন্ত, তোমার কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম আনন্দ, বিশ্ব, পাওয়া ও না-পাওয়া সবই অনন্ত। 'Finished' বলিয়া

তোমার বিশে কিছু নাই। সব-কিছুকে তোমাময় হইয়া পাইব, সব-কিছু হইব—ইহাই আমার লক্ষ্য। 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। জপ করিব—'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', কিন্তু হইব 'ব্রহ্ম ইব'। কে একেবারে ব্রহ্ম হইবে? তুমি ব্রহ্ম হইয়াই আছ আমি ব্রহ্ম ইব হইব . (Become)। তোমার জয় হউক। প্রতিভার কাল রাত্রিতে অর হয়। রেণু গোপালসহ ২ বেলা রান্না করে। উজ্জ্বল-ভারতের রূপায় অরুচি লাগানো হয়। ৫ টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। 'অমৃতস্য নাম্ন তে লোকাঃ' মন্ত্রটীর কিছুদূর পর্যন্ত আলোচনা হয়। ৭৪ টার পর মঠে গিয়া রেণু ফুল আনে। অজিতের কোন খবর নাই। রাজেন-বিভূপদ, অনন্ত দত্ত, গজেন্দ্র কর, চারু রায়, বিলাসবাবু আসে। Knock করিয়া যাইব। আমি যাহা বলি, তাহা প্রচলিত চিন্তা-ধারার সঙ্গে এতই সঙ্গতি সৃষ্টি করে যে, মানুষ ঠিক সূত্র পায় না। তাই লোক কম হয়। বলিয়া যাইব, যাহা হয় তিনি করিবেন। মানুষ shrink from fact, তাহারা fact কে face করিতে ভয় পায়, সর্ব ক্ষেত্রে সমস্যা থাকিলেও তাহারা উদাসীন, তাই বুঝিতে এত কষ্ট। মানুষ চিন্তা-জড়। নূতন করিয়া ভাবিতে শিখাইতে হইবে। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৬

পুরুষোত্তম যখন ধরার বুকে, এই সমাজের মধ্যে প্রতিটী মানুষের জীবনে অবতীর্ণ হইবেন, তখন মানুষের জীবনে, সমাজের প্রতিটী অংশের মধ্যে, জড়-অজড়, নর-নারী দ্রষ্টা দৃশ্যের মধ্যে সম্পর্কগত কি re-arrangement হইবে, কোন্ স্থানে কি ভাবে ঐ সম্পর্ক গুছাইয়া লইলে সেখানে নির্বিকারত্ব, অবিক্রিয়ত্ব, নিত্যত্ব বজায় থাকিবে, তাহার একটী মনস্তাত্ত্বিক চিত্র উজ্জ্বলভারত দিয়া যাইতেছে। তাহা কি শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে আছে? মনস্তাত্ত্বিক দিব্য রূপান্তর ব জীব বিশের রূপান্তরের অর্থ কি? এইরূপ একটী মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের ছবি সাধকের সামনে না রাখিলে সে সাধনা করিবে কিসের দিকে লক্ষ্য করিয়া? আমার শরণাগতির বুকে পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইবেন, অবতীর্ণ হইয়া আমার জীবনে এই এই রূপান্তর বিধান করিবেন, তবে না সেই রূপান্তর আমার জাগ্রত চৈতন্যের কাছে সৃষ্ট হইয়া উঠিবে? 'হঠাৎ' তো কিছু হইয়া যাইবে না? It is a psychological line of development. ব্যক্তিগত সাধনা হইতে শুরু করিলে কেমন করিয়া সর্বভূতের বুকে আত্মার সমন্বয় হইবে? প্রথম হইতেই বিশ্বকে সঙ্গে করিতে হইবে। 'মমাত্মা সর্বভূতাত্মা', 'মমাথ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্গ্রামঃ শ্রীজগদ্গ্রামঃ'। প্রথম হইতেই আত্মার সঙ্গে সর্বভূতের পরস্পরীয় সম্বন্ধ ও পরস্পর পরিপূরকত্বের স্থান বজায় রাখিয়া শরণাগত হইবার জন্য আকুলতা, লোলা হইয়া থাকিতে হইবে। নীলু আসে ১টার পর, যায় ৫টার পর।....আমি মানুষের সঙ্গে প্রথমে মিলিত হই সমকক্ষতার স্তরে, বিশুদ্ধ প্রেমের স্তরে। পরে তাহারা সেই সমকক্ষতার যোগ্য হইবার জন্য প্রেমাভক্তি ও ভক্তির সাধনা করিবে—ইহাই ছিল আশা। আমার তো প্রথমে অধিকার দান, পরে যোগ্য হওয়ার সাধনা। স্বরাজ না পাইলে স্বরাজের যোগ্য হইব কি করিয়া? জলে নামিয়াই সাঁতার শিখিতে হয়। আমার জীবনে আগে সিদ্ধি, পরে সাধনা। সর্বত্র লিখিয়াছিও তো তাই। কালিদাস রায়ের

'শ্রীবলী সাহিত্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী' শ্রীগুরুদর্শন পত্রিকা হইতে পড়ি।... আজ ১টার পর ইন্দ্রলতারত ভাকে দেওয়া হয়। ১লা জানুয়ারী

পরাণ পুতলী রাধারাণী আমার, 'রাই-রাজা'-তত্ত্ব জীবনে আস্বাদন করিব, সত্যরূপা নারীকে সমাজে জাগাইয়া দিব, তোমাকে বিশ্ব-নারীর মধ্যে একটু দেখিব, ইহাই ছিল সাধ। কত প্রার্থনা করিয়াছি, মাগো, স্বরাজ যেন মেয়েদের হাত দিয়া আসে তাই বরিশালে ঊষাঙ্গিনীকে সামনে রাখিয়া মেয়েদের সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছি। বোধহয়, আমিই সর্বপ্রথমে মেয়েদের দ্বারা প্রকাশ্য হাটবাজারে পিকেট করাইয়াছি। লবন আইন অমান্যের সময় আমিই ঊষাঙ্গিনীকে লইয়া মির্জাকালু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। ৮০ মাইল পদব্রজে যাওয়ার পর নলচিড়ায় গ্রেপ্তার হই। মেয়েরা সমাজে নির্যাতীতা, লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা, সকল সুযোগে বঞ্চিতা। তাহাদের সম্মান দিব, ইহাই ছিল জীবনব্রত। এ ভারত দেশে, বুদ্ধিমানদের সমাজে প্রাণের স্থান কোথায়? তাই কি বর্তমানে নরনারায়ণ আশ্রমে 'প্রাণ-দর্শন' বলিবার ও আস্বাদন করিবার জন্য মেয়েরাই আসিল? প্রাণদর্শন বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণ আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের বুকে একদিন সূর্যগ্রহণের সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একদল নারীবাহিনী প্রাণদর্শন লইয়া সমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অভিযান করিবে—ইহাই তো ছিল 'আশা'। প্রজ্ঞাবাদী সমাজকে তাহারা আকর্ষণ করুক। প্রাণের ঠাকুরাণী উমা একদিন শুভ্রের কাছে চ্যালেঞ্জ পাঠাইয়া ছিলেন। মেয়েরা আমায় 'বেলাজ' বলিবে, ইহাই তো চাই। পুরুষও মানুষ, মেয়েও মানুষ। মেয়েদের বেদান্ত বলিতে দোষ কি? কিন্তু সেই মেয়েই কি আসিল? কেহ কি নিজের জাতির মুক্তির জন্য পাগলিনী হইয়া ছুটিয়া আসিল? প্রাণময়ী নারী রমণীও নয়, জননীও নয়। সে শুধু বিপ্লব। জয় রাধে। বেণু ১১ টার পর বাহির হইয়া সেখ হিপোলিট ও দীপ্তি লণ্ডন হইতে চেক নিয়া আসে, যাবে যায়। সন্ধ্যার পর মণি বাগচী আসে। বুদ্ধদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'Our Buddha' বলিয়া এক বই ছাপিতেছেন। তাহাকে ব্রহ্মসূত্র দুই খণ্ড দেওয়া হয়। শঙ্কর ও বুদ্ধ একেবারে diametrically opposite। অথচ দুইয়ের মতেই সংসার মিথ্যা হয়। কেননা একত্বেও সংসার থাকে না, বহুত্ব বা ক্ষণের দ্বারাও সংসার সিদ্ধ হয় না। শঙ্করের মতে বহুত্ব অবিদ্যা; বুদ্ধের মতে একত্ব অবিদ্যা। নিত্যগোপাল মতে এক-বহু সমন্বিত। গীতা এক চিঠি দিয়াছে প্রতিভার নামে। প্রায় ১১টায় শীতল মুখোপাধ্যায় আসে, আলোচনা হয়। সে বলে আমার গুরু দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি কি তাহা কখনও বলি! আমি psychology আলোচনা করি মাত্র। ব্যক্তিগত প্রশ্ন আনিলে আর আলোচনা চলে না। ইহা মানিতে পারি না বলিলে সেখানেই আলোচনা শুরু হয়। যুক্তিযুক্ত হইলে সব যে মানিতে প্রস্তুত, তাহার সঙ্গেই আলোচনা করা যায়। যাহারা জিজ্ঞাসু হইয়া না আসে, তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ৩রা জানুয়ারী।

যে-পুরুষোত্তমের অবতরণে এই বিশ্বের দিব্য রূপায়ণ সম্ভব হইবে, সেই পুরুষোত্তম-বস্তুটী কি,

তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে কি করিয়া ভক্ত তাঁহার কাছে নিজেকে উন্মোচিত (unfold) করিবে? মানুষ তো psychology নিয়াই চলে? পুরুষোত্তম কি মনস্তত্ত্বের একান্ত ঊর্দ্ধ, না ঊর্দ্ধ হইয়াও অনুগ? 'তদের সন্ধ্যা তদেবান্ত প্রারিশং'। তিনি মনের, 'either-or-এর ঊর্দ্ধ, কেননা সেখানে মনের দ্বিধা বিকাশ antagonistic হইয়াও complementary। তিনি যতই মনের স্তরে অবতরণ ক'রবেন, ততই বিশ্বের সব পরস্পর-স্পর্দ্ধী বিবিধ বিকাশ সমন্বিত হইতে থাকিবে। এবম্ভূত স্বতঃসিদ্ধ প্রাপনার পুরুষোত্তমের কাছে সরণাগতিই তো তাঁহাকে আমার জীবনে অবতরণ করাইবে? এই psychological process না জানিলে কি করিয়া কি লক্ষণে ভক্ত বুঝিবেন যে তিনি অবতরণ করিতেছেন কি না, দিব্য রূপান্তর তো slow process-এ Becoming-এর ভিতর দিয়া হইবে। ইহা কোন mystic ব্যাপার নয়। প্রথমে হইবে প্রকৃতির পরিবর্তন, পরে সে পরিবর্তন অহঙ্কারে, পরে চিত্তে, পরে মনে, পরে সত্ত্বে রজতে তমোতে অবতরণ করিবে। সারা বিশ্বে এইভাবে 'দ্বন্দ্ব সমাস' ঘন হইয়া উঠিতে চাহিবে। এই পন্থা তো creative ইহা হঠাৎ হইয়া যাইবার পথ নয়। পুরুষোত্তমের সমান-ধর্মী হইয়া, তাঁহার বুকে বুক মিলাইয়া, অন্তরাত্ম রমণের ভিতর দিয়া বিশ্বকে পুরুষোত্তম-বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধি, ইহাই সাধনা। পুরুষোত্তম বৈদিক পরমাত্মা নন। পরমাত্মা পুরুষোত্তমের অংশ-বিভূতি। গীতার চতুর্থ পুরুষই পুরুষোত্তম। 'অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ'। বেদ-যুগান্তরে দিবার জন্য 'ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক স্বাতন্ত্র্য' এবম্ভূতীর কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া লেবে। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই কিনিয়া আনে। অনুগত হইয়া অনুগত করিতে পারি নাই সারা জীবন সকলের পিছনে ঘুরিয়া। আমিই আগাইয়া গিয়াছি, তাহারা শুধু পাইয়াছে. ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়াছে। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া, ঘটনার ভিতর দিয়া আনুগত্য শিখাইতে হয়। এইবার আমি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইব. আমাকে 'ধরিয়া' আমার অনুগত হইয়া তবে পাইতে হইবে। আমি হইয়াছি 'অনুগত', ইহারা হইয়াছে 'উদ্ধত'। আমার মনোমত কে হইতে চায়? যে যাহার নিজের মনের কল্পনা লইয়া মশগুল। বছরে দুই বার ইংরেজীতে বাহির করার আলো-চনা হইল। ৪ঠা জানুয়ারী

পুরুষোত্তম যদি 'পরমাত্মা' হন, তবে তাঁহার অবতরণ (descent) ধারণ করিলে এই বিশ্বের দিব্য রূপান্তর হবে কেমন করিয়া? পরমাত্মায় তো পরম স্নেহের স্থান নাই। পরমাত্মার শক্তি মহামায়া। ব্রহ্ম ও ভগবানের মাঝে পরমাত্মা রহিয়াছেন। দেহকে দিব্য রূপান্তরিত করিতে হইলে চাই যোগমায়ার কৃপা, পুরুষোত্তম-কৃপা। পরমাত্মা যতখানি এই বিশ্বকে সার্থক করিতে পারেন, ততটুকুই মাত্র রূপান্তরিত হইবে। বুদ্ধিক্ষেত্র, মনঃক্ষেত্র, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্র খুব অল্পই পরমাত্মা-দ্বারা ভাবিত হইবে। পরমাত্মা তো ঈশ্বর—'যো বিভূতি অবায়ঃ ঈশ্বরঃ'। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'। ঈশ্বরের শাসনে জীব যতটুকু বদলায়, ততটুকুই মানুষের প্রকৃতি বদলাইবে। জীবের 'আত্মবান' হওয়া ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুতেই সার্থক হইবে না। ঈশ্বর-সাযুজ্যে

জীব যাহা হয়, বিশ্বও তদ্রূপই ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করিবে। পুরুষোত্তম-সাযুজ্য, পুরুষোত্তম-সাধর্ম্য লাভ না করিলে মাটির ক্ষেত্র কিছুতেই রূপান্তরিত হইবে না। ঈশ্বর-পরমাত্মা ভর্তা, প্রকৃতি তাঁহার ভার্যা। পরমাত্মা 'অব্যয়'। কিন্তু পুরুষোত্তম হইতেছেন তাহা যাহা পরমাত্মা প্রকৃতির সঙ্গে মৈথুনের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়া হন (Begotten God)। তিনি অনন্ত বার করিয়াও 'অব্যয়' রহেন। পুরুষোত্তম ক্ষর-অক্ষর-পরমাত্মার সমন্বয় সর্ব গুহ্যতম তত্ত্ব। ব্রহ্ম গুহ্য, পরমাত্মা গুহ্যতর, ভগবান-পুরুষোত্তম গুহ্যতম। 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি সন্' হইতেছে পরমাত্মা, আর ভগবান হইতেছেন 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'। এই গুহ্যতম পুরুষোত্তমের অবতরণ-সম্ভাবনা দ্বারাই বিশ্বের দিব্য রূপান্তর সম্ভব'—'সম্ভবামি'। রাত্রি ৭॥. টার পর প্রণব আসে। তাহার বাবা ও শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাকে করিতেছে সংসারী হইবার জন্য। সে প্রস্তুত নয়। দূরে চলিয়া যাইতে চাহে। আমি রাধা রাণীর জটিলা কুটিলার মধ্যে থাকার কথা বলায় উহা তাহার ভাল লাগিল। প্রণব হিন্দী জানে, বক্তৃতাও দিতে পারে। সে যদি ঠাকুরের হইত, অনেক কাজ করিতে পারিত। কেহই তো ঠাকুরের হইল না? ঠাকুর কি অচলই হইয়া থাকিবেন? ৫ই জানুয়ারী

পুরুষোত্তম যেখানে psychology-র ঊর্ধ্বে, সেইখানেই তিনি অচিন্ত্য। 'ন তাং তর্কেন যোজয়েৎ' mysticism। Either-or-এর সমন্বয়, সগুণ-নির্গুণ সমন্বয়, পরস্পরবিরুদ্ধ সমন্বয়, simultaneous প্রশ্নোত্তরে। তিনি যখন psychology-র অন্তর্গ, অন্তঃপ্রবিশৎ, তখন তিনি succession, মন-বুদ্ধির গোচর, আমার psychology-দ্বারা অধিগত হন, ধরা দেন আমার সকল দ্বন্দ্বের মাঝে সেখানে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য। দেহ-দেহী সমন্বয় সত্তাই অনির্বচনীয়, যদি না তাহা ক্রম-অবলম্বন করিয়া কখনও দেহের ক্ষেত্রে, কখনও বা দেহীর ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইত। জাগ্রতের ক্ষেত্রে 'ইহা ইহা নয় উহা' এই ভাবেই মন খেলে। পুরুষোত্তমও এই খেলায় যোগদান করিয়া মনের স্তরে প্রাণ-আস্বাদন ছড়াইয়া দেন। তাই পুরুষোত্তম ব্রজধামে জীবের সকল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে রমণ করিলেন, খেলা করিলেন; ঊর্ধ্ব ও অধ-এর সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। ইহাই তো বিশ্বের দিব্য রূপায়ন। শ্রীঅরবিন্দ কি এই ভাবে দিব্য রূপায়ন বলেন? পুরুষোত্তমের পরমাত্মা-অংশদ্বারা এই রূপায়ন সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দ যে রূপায়নের কথা বলেন, তাহার মধ্যে চিদংশ বেশী মৃদংশ অপেক্ষা। এখানে জড়ের দাবী ঠিক যথার্থভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইহাও ভাবুকের বিশ্ব, রসিকের নয়। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বে 'রসো বৈ সঃ'-এর সার্থকতা নাই। শ্রীনিত্য-গোপাল এইখানেই শ্রীঅরবিন্দেরও পরের কথা বলিয়াছেন। রণু পাণ্ডীবাবুর বাসা হইতে মাসিক দেয় ৫ টাকা লইয়া পোষ্টাফিস, মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক, যুগান্তর হইয়া সন্ধ্যার পর ফেরে। সন্ধ্যার পর জয়া আসে।....নীলুর এক পোষ্টকার্ড আসে।.... গৌর সাহা পরিকল্পনা বাবদ ১০ টাকা পাঠায়। গতকাল 'যুগান্তরে' নরনারায়ণ আশ্রম পরিকল্পনার

সাহায্যের আবেদন বাড়ির হয়। যতীন দাশগুপ্ত বৈকালে আসে। 'ভারতীয় আরণ্যক-নাগরিক সভ্যতা' মাঘের জন্য লিখিতে আরম্ভ করি।

৬ই জানুয়ারী

বন্ধুকে বন্ধুর মূল্যে স্বীকার করিয়া, বহু রাশিয়া 'এক' করিতে গেলে মন-বুদ্ধির স্তরে সম্ভব নয়। বুদ্ধির ঐক্য যান্ত্রিক, সেই ঐক্যের মধ্যে একের শোষণ বহুর উপর চলিতে থাকে, এই ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াই এক দল শোষকের সৃষ্টি হয় 'বহু' উহাদের কাছে শ্রমিক মজুর বড় বেশী কিছু নয়। বর্তমানে যে 'নগর' গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বুদ্ধির ঐক্যের উপর। তাই নগরদ্বারা গ্রাম শোষিত হইতেছে। প্রাণের স্তরে গ্রামের স্বাধীনতা, বহুর স্বাধীনতা অটুট থাকে। নগর সেখানে স্বল্প-পরিসর, গ্রামের সেবক মাত্র; বুদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামের রক্ত, বহুর রক্ত শোষণ করিয়া নগর পুষ্ট, একের কলেবর বর্দ্ধিত হয়। নগরে কলকারখানার প্রসার হয়। তাই যৌথ-প্রথায় 'চাষ' দ্বারাও চাষী কৃষক মজুরে পরিণত হইবে বলিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ অভিমত দিয়াছেন। বুদ্ধির স্তরের 'যৌথ' শোষক হইবেই। সেখানে খোলা প্রাণে কেহ কাহার সঙ্গে সংহত হয় না। Dictatorship of the proletariatও বুদ্ধির উপর স্থাপিত। রাশিয়ার সঙ্ঘ প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া সেখানে জন-সাধারণ ব্যক্তি-সাধনা হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য। এই ভবিষ্যৎ বিশ্ব প্রাণের উপর সংহত হইবে। প্রাণ-সাধনায়ই বিশ্ব-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে। নিতাগোপাল জ্বরযুক্ত হইয়াছেন। রেণু চশমার জন্য দক্ষিণেশ্বর যায় ৭ টার মধ্যে।.. সন্ধ্যার পর পরিমল মৈত্র আসে। রেণুর কাছে সে এক প্রবন্ধ চাহিয়াছিল এক পত্রিকার জন্য। রেণু বলিয়াছিল আশ্রমের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে। ইহা লইয়া সে যাহা খুশী বলিয়াছে। কি যে অদ্ভুত এই সংসারের লোক! প্রবন্ধের বিনিময়ে পয়সা চাওয়া হয় নাই; বস্তু হিসাবেই চাওয়া হইয়াছিল। আর পয়সা হিসাবে চাহিলেই বা দোষ কি?

৭ই জানুয়ারী

জীবনে বণিকবৃত্তি কাহারও সঙ্গে কোনদিন করি নাই। এতদ্বারা ভাল বাসিয়াছি। যতটুকু helpful হওয়া সম্ভব, যতখানি service দেওয়া আমার কুলায়, মানুষকে তাহা দিয়াছি। তবুও কি আমি 'give and take'-এর দলের লোক বলিয়া পরিমল মৈত্র বলিল? বলিবার আমার কিছু নাই। প্রায় সকলেই তো আমার এই এক তরফা সেবার অপব্যবহার করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ'। ভালবাসায়ও কি পারস্পরিকতার অভাব হইলে প্রেম জন্মে? স্বধর্ম হইতে ক্রমে ক্রমে রাধা-প্রেম পর্যন্ত hierarchy অবলম্বনে পৌঁছিলে (যদি সম্ভব হয়) সে প্রেম তো জ্ঞান-কর্মের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাববিলাসের সৃষ্টি করিবে। স্বধর্ম হইতে প্রেম স্বীকার করিলে প্রেম হইতেও আবার স্বধর্মে আসিতে হইবে। কিন্তু একবার স্বধর্ম হইতে ক্রম অনুসরণ করিয়া প্রেমে গেলে আবার প্রেম হইতে স্বধর্মের ক্ষেত্রে অবতরণ সম্ভব হইবে না। তাই দুই-ই সমকালীন, simultaneous হওয়া প্রয়োজন। শ্রীভগবানকে বা সদ্‌গুরুকে সর্বপ্রথমে আশ্রয় না করিলে মনের স্তর হইতে রওয়ানা হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রেম লাভ করা ছাড়া উপায় থাকে না। প্রেম ও জ্ঞানের পরীক্ষা বা

স্থিতিভূমি হইতেছে কর্মক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্র পবিত্র যখন প্রেম প্রসারিত হয়, তখনই প্রেম জন্মিয়া উঠে। একান্ত প্রেম বা জ্ঞানে কাঁকি চলে, সংকল্প বিকল্পের অবসর থাকে। চিত্ত দক্ষিণেশ্বর হইয়া ১টার পর আসে। ঠাকুরের জন্য প্রকাণ্ড একটী গাঁদা ফুলের মালা ও ফুল আনে। ৪টায় পাঠ আরম্ভ হয়। Divine psychology-র অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, Divine Nature-এ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ইহাই ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য ভাগবতী প্রকৃতিতে শক্তিমান ও শক্তি অন্যোন্য-মিথুন, পরকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'যো যঃ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—যে যাহাকে শ্রদ্ধা করে, সে তাহাই হয়। ভগবানের শরণাগত হইয়াছি, তাঁহার নাম করি, অথচ প্রকৃতির বদল হয় না, ইহা মিথ্যা কথা। পুরুষোত্তম শক্তিমান হিসাবে স্ব-প্রকাশ, শক্তি হিসাবে প্রকৃতিস্থ তিনি প্রকাশ-মূর্তি। এই দুই-এর মাঝে gradualness, vagueness, half-tone আছে; কেননা ইহা যে organic life, অবিরাম ইহা evolution-এর পন্থা অনুসরণ করিয়াই চলে যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ জন্ম লয় most naturally। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে একটী অনির্বচনীয়তার কাঁকি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, অধিকারও নাই। পাঠে নূতন লোক ২ জন আসিয়াছিলেন। ৮ই জানুয়ারী

Divine life-কে ধারণ করিতে হইলে শরণাগতির ভিতর দিয়া divine psychology বুঝিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার অবতরণে সাধকের জীবন সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিল কি না, সাধকের প্রকৃতি (divine nature) রূপান্তরিত হইল কি না, অহম্-বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় দেহ ভাবভাবিত হইল কিনা তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, পুরুষোত্তমকে যে আমার psychology-র বাহিরে অচিন্ত্য অ-র্ক্য করিয়া রাখিলে চলে না। তিনি যখন অবতীর্ণ, তিনি যখন জীবের সামনে দাঁড়াইয়া জীবের মনস্তত্ত্বের গোচরীভূত হইতেছেন, মানুষ যখন তাহার এই ইন্দ্রিয় লইয়াই তাহার সঙ্গে ব্যবহারাদি চালাইয়াছে, তখন তিনি মানুষের মনোবুদ্ধির গম্যও বটেন, চিন্ত্যও বটেন। তাই তাঁহার psychology জানা যায়, জানিতেও হইবে। Human psychology-র মধ্যেই যে তিনি অবতরণ করিলেন। তিনি mysticism-এর ঠাকুর নন। পুরুষোত্তম psychology-তে The law of Excluded middle নাই, সেখানে simultaneity যেমন আছে, succession-ও তেমনি আছে, সেখানে part ও whole correlative, সেখানে অংশসমূহ (part) নিরংশ (indivisible whole)। জীবের psychology যখন Divine psychology দ্বারা 'transformed' হইবে, তখনই তাহার পূর্ণ সার্থকতা মিলিবে, পুরুষোত্তম-সান্নিধ্য লাভ হইবে। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ইব ভবতি'। ঠাকুর, তুমি এই divine psychology মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছ—তোমার জয় হউক। ৯ম বর্ষের মাঘের কিছুটা লেখা প্রেসে আজ দেওয়া হয়। রেণু ৪ টায় চলিয়া যায় দোকানে যায়। ...নিত্যগোপাল-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হয়, ধীরেন ব্যানার্জী আসে। প্রবুদ্ধ ও অমৃত বাজারের cutting (রামকৃষ্ণদের বক্তৃতা) দেয়। প্রণব আসে, তাহার বাবা ও মা তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণ-পত্তিত মহাশয় আমার নিকট এক পত্র দিয়াছেন অনুমতি

দিয়া। খুব মহানুভব বটে। আমার উপর তাঁহাদের দায়িত্ব বর্তাইল। প্রণব আমার বই পড়িতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 'প্রাণ-নাথ' বলায় প্রাণ সম্বন্ধে তাহার কিছু উপলব্ধি হয়। প্রণব আমার আশ্রমেই থাকিবে বলিল। বৈকালে নীরোদ দে আসেন আগামী ১২শে রবিবার অশ্বিনীবাবুর জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি হইবার অনুরোধ লইয়া। ঐ দিন রবিবার। এখানের আলোচনা শনিবার ঠিক হইল। লীলা আসে নরেন ও লীলা সহ ৩ দিন থাকিবে। প্রণব সন্ন্যাসী হইবার কথা বলে। ২রা জানুয়ারী

ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'গুরু শিষ্যকে যে শক্তি দিয়া কৃপা করেন তাহার অপর নাম মন্ত্র। কৃপাশক্তিই যখন মন্ত্র, স্নেহশক্তি ভক্তিশক্তি প্রেমশক্তি তো মহামন্ত্র। আমি ইহাতেই বিশ্বাসী। দীক্ষা জীবনের ব্যাপার। আক্ষরিক দীক্ষার চেয়ে জীবনগত দীক্ষাই আমি ভালবাসি। সাধারণ লোকের জন্য যান্ত্রিকী দীক্ষার প্রয়োজন হয় বাহিরের দিক হইতে একটা 'বন্ধন' সৃষ্টি করার জন্য, কিন্তু আমার ভাল লাগে 'পথ বেঁধে দিল বন্ধন-হীন গ্রন্থি. আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী'। রাধা কোন দীক্ষা কৃষ্ণের কাছ হইতে পাইয়াছেন? নন্দ-যশোদা-সুবলাদির কি দীক্ষা হয় নাই? অর্জুন কি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন কৃষ্ণের? ইঁহারা সকলেই প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত। কোনও বাহিরের ceremonial বন্ধন নাই। অথচ এ বন্ধন জীবনময়। ভিতরে যদি প্রেম না থাকে, বাহিরের দিক হইতে বাঁধিয়া রাখিবার কি মূল্য আছে? দেহে প্রাণে মনে আত্মায় এক হওয়াই দীক্ষার পরম প্রয়োজন। হৃদয়ের আদান-প্রদান দীক্ষা-রহস্য। পুরুষোত্তম-জীবন লাভ ও তাহাকে বিশ্ব-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই পুরুষোত্তম-দীক্ষিতের চরম লক্ষ্য। দীক্ষার মন্ত্র জ্ঞান ভক্তি প্রেম কর্ম। আমি এই দীক্ষায় সহস্র সহস্র লোককে দীক্ষিত করিতে চাই। রেণু হেসে কলি দিয়া আসে। নরেন জেনারেল প্রিন্টার্সে ১০ খানি শেয়ারপত্র বিক্রয়ের জন্য দিয়া আসে। রেণু ও লীলা চক্ষু দেখাইবার জন্য সেবাজারে যায়, ফেরে রাত্রি প্রায় ৮ টায়। হুগলীর উকিলবাবু হইতে এক ভদ্রলোক রবিবারের পাঠের খোঁজ লইতে আসেন। অমরেশ আসে, কালী দর্শন করিয়া এখানে খাইবে ও অপরাহ্ণে যাইবে বলিয়া গেল, অথচ আসে নাই। প্রণব আসে। অনেক কথা হয়। সে সব কিছু বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার জন্য উন্মুখ। 'প্রাণের গুরু' সম্বন্ধেই তাহার জিজ্ঞাসা। প্রচলিত ধ্যান ইহার পক্ষে উপযোগী নয় কেননা ইহাদ্বারা বাহির বাদ পড়িতে চায়। বাহির ও ভিতর দুইদিকে সমভাবে ভগবানকে নিয়া যাতায়াত করিতে হইবে অক্ষর ও সর্বভূতের স্তরে। কোনও জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শরণাগত না হইলে দুই দিকের সাধনা সমভাবে চলিতে পারে না।...১০ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি নিজের মহাপ্রাণ দিয়া মানুষের প্রাণ চাহিয়াছ, তাহার প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিয়াছ, প্রাণ দিয়া প্রাণ সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছ, তাই মন্ত্রজপ, আচার প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। আমার দীক্ষার মন্ত্র ৭টি অক্ষরযুক্ত; তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি হইতেছে বীজমন্ত্র। তুমি বলিয়াছিলে, যদি নিতান্ত অসুবিধা হয়, তবে প্রথম দুইটী বীজাক্ষর ১৮ বার জপ করিলেই হইবে। তবে সাধারণতঃ

ঐ অখণ্ড মন্ত্র ১০৮, ১০৮, ৫০৮, ৮০৮ এইভাবে জপ করিবে। আচার সম্বন্ধে বলিলেন, 'মাংস কিম্ব না খাওয়াই ভাল। তবে ইচ্ছা হইলে মাংস মায়ের প্রসাদ খাইতে পার। আর শুদ্ধিমতে যার তার উচ্ছিষ্ট খাওয়া বিধেয় নয়। তবে গুরু, পিতামাতা গুরুজনদের প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে'। ইহা কি সাধকদের পক্ষে করণীয় বলিয়া গণ্য কেহ করিবে? এতদিনকার সাধনা কি এত কম আড়ম্বরপূর্ণ? প্রাণ-সাধনা বলিয়াই এইরূপ সাধনের সহজতা সম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি প্রাণের দিকই না থাকে, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে কিসে রক্ষা পাইবে? ভিতরে প্রাণের যোগ নাই, বাহিরের আচরণও একরূপ নাই বলিলেই চলে, উপায় কি হইবে? তুমি সম্প্রদায়কে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। তোমার জয় হউক। অমরেশ ভোরে আসে। চা-মিষ্টি খাইয়া নরদীপ চলিয়া যায়। রেণু রণেন দত্তের বাড়ী যায়। পরিকল্পনা বাবদ ১০ টাকা দেয়। রেণু ও হরিপদ টীল কর্পোরেশনের ডিরেক্টারের ওখানে যায়। ১/১ টা পার্টিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কোন করিয়া বলিয়া দেয়। কাল আবার যাইবে। ডাঃ মুখার্জীর ওখানে রেণু যায়। পরিকল্পনার বাকি ৫০্ টাকা দিয়া দেন। ডাক্তারবাবু উদ্বোধন হইতে রবীন্দ্রনাথ ও উদ্বোধন নিজেই পড়েন, ভাল লাগিয়াছে। ললিতবাবু কাল ও আজ আসেন। নরেন বঙ্গবাসী কলেজে যায়। অমলবাবু সন্ধ্যার পর আসে। সকালে প্রেসের শচীবাবু আসে। তাহাকে দিয়া প্রুফ দেখাইব স্থির হয়। প্রতি ফর্মা ১ বার দেখিবে— ৪.০০+১.০০=২৪.০০ টাকা। ১১ই জানুয়ারী

গত কল্য 'চন্দননগর' হইতে আচার্য বিনোবার 'শান্তি'-র উপর এক প্রবন্ধ পড়িলাম। যে-শান্তি বৈষম্যপূর্ণ আবেষ্টনকে গড়িয়া তুলিতে না পারে সে শান্তিকে তিনি শান্তি বলেন না, কিন্তু তিনি কি তাঁহার এই কথা তাঁহার অনুসৃত দর্শনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন? প্রচলিত দর্শনে বৈষম্যের বাহিরে সাম্য, শান্তি। অথচ তিনি লিখিতেছেন, 'শান্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই বৈষম্যের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া চলিবেন। তাঁহার মতে কন্ট্রাস্টের বাহিরে শান্তি নয়। কিন্তু প্রচলিত দর্শনে কি তাহাই নয়? কড় ও শান্তি একই সঙ্গে কি করিয়া প্রচলিত দর্শনের মধ্যে তিনি স্থান দিবেন? যুগের হাওয়া যাহারা চিন্তাশীল তাহাদের সকলকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কিন্তু যুগদর্শন লাভ হইয়াছে কয় জনের! শ্রীনিতাগোপাল-রূপ ছাড়া ইহা কোথায় মিলিবে? শ্রীনিতাগোপাল এই দর্শনের মূর্ত বিগ্রহ। এতকাল তো তাঁহাকে বাদ দিয়াই এই দর্শন পথে ঘাটে ছড়াইয়াছি। কেহ জানিতে পারে নাই এই দর্শনের উৎস কোথায়, কে ইহার দৃষ্টান্ত। কেহ আসুক বা না আসুক, কারো ভাল লাগুক বা না লাগুক, এই দর্শন যে নিতাগোপালেরই দর্শন তাহা যতদিন জীবন আছে, ততদিন বলিয়া যাইব, তবের একটা দৃষ্টান্ত না দিলে তত্ত্ব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন। রেণু ১৪. টায় বাহির হইয়া সেক্রেটারী বোর্ড ও মন্মথ রায়ের ওখানে যায়। মন্মথবাবু ৫ টাকা পরিকল্পনা বাবদ দেন। তিনি রেণুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা কি নিতাগোপালকে রামকৃষ্ণের গুরু বলেন'? রেণু বলিল, 'তা

বলিব কেন? তাঁহারা দুইজন অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন, এই বলি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের পূর্ব পর্যায় দিয়া গিয়াছেন, শ্রীনিত্যগোপাল দিয়াছেন পর পর্যায়'—আমাদের এই উক্তির অর্থ উহারা এইরূপ বুঝিয়াছেন। সন্ধ্যার পর প্রণব আসে। আগামী ১৩শে জানুয়ারী সে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা প্রস্তাব করে। সে definite। আমি না দিলে অন্যত্র নিবে। তবে আমার কাছ হইতে নিবারই তাহার আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প। আমি সময় নিবার কথা বলি। সে বলে 'শুভস্য শীঘ্রম্'। মঠে হইবে। ১১ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার জীবনের স্পর্শে আমি বুঝিয়াছি, 'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বলিয়া বোধ হয়'—তোমার এই বাক্যের অর্থ। আমি গৃহী হইয়াই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী, অবধূত। শ্রীকৃষ্ণ সংসারী না সন্ন্যাসী? সংসার সৃষ্টির উন্মেষের দিক, সন্ন্যাস নিমেষের (প্রলয়ের) দিক। সংসারাবস্থায় ভগবান বহু হন, বিস্তৃত হন, সন্ন্যাসে ভগবান এক হন, নিজেকে গুটাইয়া লন। সংসার বহির্মুখী দিক, সন্ন্যাস অন্তর্মুখী দিক। জীবন মহাসিদ্ধাবস্থায় এক হইতে বহুতে এবং বহু হইতে একে, বহির্মুখী হইতে অন্তর্মুখীতে, অন্তর্মুখী হইতে বহির্মুখী গতিতে সমানভাবে যাতায়াত করিতে পারে। ইহাই 'এক' বলিয়া মনে করা, উপলব্ধি করা। সংসার কর্মময়, সন্ন্যাস জ্ঞানভক্তিময়। কর্ম হইতে জ্ঞান-ভক্তিতে, জ্ঞান-ভক্তি হইতে কর্মে সমভাবে যাতায়াত করিতে পারাই মহাসিদ্ধাবস্থা। জ্ঞান হইতে কর্মে বা কর্ম হইতে জ্ঞানে একান্ত ভাবে আসিতে পারিলে উহা হয় সিদ্ধাবস্থা। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে সমভাবে বিচরণ করিতে পারিলেই উহা হয় মহাসিদ্ধাবস্থা। মহা সিদ্ধাবস্থাতেই শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীত, বহু সাকারে অদ্বৈতজ্ঞান সিদ্ধাবস্থা সাকারে নিরাকারে অদ্বৈতজ্ঞান মহাসিদ্ধাবস্থা। ইহা দুর্লভ। ঠাকুর, তুমি এই মহাসিদ্ধাবস্থার মূর্ত বিগ্রহ। লীলা তাহার পুত্রকন্যাসহ রাণাঘাট যায় ১২ই চৈত্র পর। রেণু ১৫ই চৈত্র পর বাহির হইয়া কোথায় গঙ্গার উপরে ঘুরিয়া হরিপদর এক পাটির ওপারে যায়। আনন্দবাজার ঘুপচির হইয়া সন্ধ্যায় ফেরে। প্রেসের আজ পর্যন্তও কোন সাড়াশব্দ নাই। কি স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল আবেষ্টনের মধ্যেই পড়িয়াছি। কিছুতেই তো, ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া আগাইতে পারি না। গোপাকে পড়াইবার জন্য বেশ খাটিতে হইতেছে, অথচ পড়ায় তেমন মন নাই। শান্ত সস্নেহ ব্যবহার না করিলে কেমন করিয়া পড়াইব? মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। অথচ যে যাহা তাহাকে তো তেমন করিয়াই handle করিতে হইবে। তাহাকে বক্ষে আনিতেই হইবে। জীবনে সংগ্রাম করিয়াছি ঠাকুরকে নিয়া কি পরাজিত হইব? বিজয়ার সন্তান আমি বিজয় আমারই জন্য বিধির বিধানে। হরিদাসী বেলার মারফত পৌষসংক্রান্তির জন্য চালের গুড়া....পাঠাইয়া দিয়াছে। পুত্রতুল্য এক পোষ্টকার্ড আসিয়াছে, ...। ১৫ই জানুয়ারী

পুরুষোত্তম-দর্শনে প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দাদি প্রমাণগম্য পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া যত তাঁহাতে আত্মসমর্পণদ্বারা আত্মলয় সাধিত হইবে ততই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভ হইবে। নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ হইলে তাহাতে স্থিত হইয়া তবে

না। সন্ধ্যায় সুযোগ আসে, দাদুর টাকা, নিজের ১৲ টাকা দেয়। নিতাইকে ওষুধ...বাবদ দেওয়া হয় ৭৲ টাকা। ১৬ই জানুয়ারী

ভাগবতী প্রকৃতির বিধানে 'ঘটনা' আসে ঘটে, পরে তাহাকে পরিপাক করিবার মন আসে ও যোগাড়ায় হুঁশ উঠে। প্রথমে নারায়ণ—নরসিংহ—রাম—কৃষ্ণ—গৌর—নিতাগোপাল স্তরে স্তরে প্রকটিত হইয়াছেন। এই বার এই becoming-এর ধারাকে জীবনে বরণ করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। বর্তমান বিশ্বের সমস্যা সমূহের সমাধান-রূপ 'কল' নিতাগোপাল। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছে পূর্ব-স্তর। আমাদের একক নিতাগোপাল স্পর্শ পাইবার পর বুঝিতে হইবে কেমন করিয়া নারায়ণ-ধারা নরহরি-রাম-কৃষ্ণ-গৌর ধারার মিলনের ফলে নিতাগোপাল সৃষ্ট হইয়াছেন। আমি তো নিতাগোপাল-জীবনের কথাই রাম-কৃষ্ণ গৌরকে পাইয়াছি। বই পড়িয়া নয়; নিজ মনস্তত্ত্বের মধ্যে শ্রীনিতাগোপাল is the last term। তাঁহাকে ধরিয়াই পূর্ব স্তরকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমার সোনার নিতাগোপালে বিশ্বের সব ধারার সমন্বয় দেখিতেছি। তিনি আমার 'সর্বাণি সর্বম্,' সাক্ষাৎদোর, প্রাণ-বল্লভ, আমার সর্বস্ব ধন; তাঁহার জীবনে আমি জীবন মিলাইব। তিনি ছাড়া আমি কে? কী আমার মূল্য তাঁহার বাহিরে? যতখানি তিনি, আমার জীবনে প্রকাশিত, ততখানিই আমার কাছে আমি প্রকাশিত। তাঁহার প্রকাশেই আমার প্রকাশ। আমি তোমাময় হইয়াই তোমাকে পাইব।' 'তুমি ঝরিয়া না গেলে আমি তোমাকে পাইব না, ইহা আমি বুঝিয়াছি। তোমার জন্য হউক বা যেমন ভাবেই হউক না কেন, আমি তোমাকে পাইব।' ১৭ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি এই বিশ্বের দিব্য রূপান্তর বিধানের জন্যই অবতীর্ণ। বিশ্বের বুকে দিব্য বিশ্ব আছে বলিয়াই তাহাকে বিকশিত করা সম্ভবপর। ভূণে যখন আছে বলিয়াই তরু যখন রূপে রূপান্তরিত হয়। তুমি এই বিশ্বকে 'সত্তা' বলিয়া গিয়াছ। কিন্তু ওই রূপান্তর তো জৈব মনস্তত্ত্ব দ্বারা সম্ভব হইবে না। দিব্য রূপান্তর বিধানের জন্য প্রয়োজন divine psychology-র। 'মনসঃ মনঃ যিনি, যিনি মনের মন তাঁহার মনস্তত্ত্বই এই বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। জৈব মন চলে either-or-এর পথ ধরিয়া, আর ভাগবত মন চলে প্রথমে simultaneity-র পথে, পরে succession-এর ধারা ধরিয়া। জীবের স্তরে যে বিশ্ব মায়া, ভগবানের স্তরে তাহাই 'প্রপঞ্চ'। ভগবান নিজ psychology-দ্বারা জৈব psychology-কে আবিষ্ট করিয়া, প্রতি দুইটি বস্তুকে 'excluding each

other' পরস্পরকে complete করিয়া গড়িয়া উঠিবার প্রেরণা দান করে। এই বিশ্ব মিথ্যা হয় তখনই যখন প্রতিটী দুই পরস্পরকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়, include করিতে চায়। ইহাদ্বারা পরস্পর-পরিপূরকতা জন্মে না। ভগবানের স্তরে প্রতিটী দুই পরস্পরকে বহির্গত করিয়া, exclude করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করে (complete)। এই exclusion-তত্ত্বই, পরকীয়-তত্ত্বই বিশ্বের অণু পরমাণুতে নিহিত। এই পরকীয় ভাবে বিশ্ব গড়িয়া উঠিলেই বিশ্ব দিব্যভাবে রূপান্তরিত হইবে। রেণু ২টায় বাহির হইয়া চাকেশ্বরীতে ১০ রীম কাগজ, র‍্যাপার ও কাভারের কাগজের অর্ডার দিয়া, চশ্মার পাওয়ার ঠিক করিয়া ও উহা দোকানে দিয়া ৬৪. টার পর ফেরে। নীরেন ব্যানার্জী আসে। এ মাসের পত্রিকা এখন পর্যন্ত ১ ফর্মাও ছাপা হইল না। অথচ এই মাঘের মধ্যে বাহির হওয়ার কথা ছিল। এই সংসারে থাকিব কেমন করিয়া ঠাকুর? মানুষ এত স্বার্থপর! ১৮ই জানুয়ারী

একান্ত নারায়ণ, একান্ত নর বা একান্ত বিশ্ব মানিলে কাহাকেও সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, পাওয়া যায় না। নারায়ণ ধরিলে কর্মের ব্যাখ্যা হয় না, একান্ত নর ধরিলে করুণার ব্যাখ্যা হয় না। একান্ত নারায়ণ ধরিলে বা একান্ত নর ধরিলে জগৎ ব্যাখ্যাত হয় না। কর্ম ছাড়া করুণা নাই, করুণা ছাড়া কর্ম নাই। কর্মে ব্যক্তিত্ব-সিদ্ধি, করুণায় ব্যক্তিত্ব-লয়। কর্মক্ষেত্রে আমি আমার নৈষ্কর্ম্য ক্ষেত্রে আমি নারায়ণের। নৈষ্কর্ম্যই একান্ত জ্ঞান বা প্রেম। চাই জীবনে নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণ কর্ম যাহা নরনারায়ণ 'উবাচ চচার চ'—বলিয়াছেন ও আচরণ করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির ভিতর দিয়া কর্ম বিশ্বকর্ম হইবে, কর্মের দিব্য রূপান্তর সাধিত হইবে, সমগ্র বিশ্ব 'এক' হইবে। আজ ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন স্তর ও দিক, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বকে গুছাইবার (re-arrangement) দিন আসিয়াছে। এইখানেই বিশ্ব সমস্যার সমাধান। 'সমাধান' যখন অবতীর্ণ, তখন সমস্যাকে সেই ভাবে ভাবিত হইতেই হইবে ধীরে ধীরে। না হইয়া উপায় নাই। ফলের খোঁজ যখন মিলিয়াছে, তখন সমস্যা তাহার ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। শ্রীনিতাগোপাল ভাই আমার সারা জীবনের ধ্যান। তাঁহার ধ্যানই আমার সর্ব সমস্যা সমাধানের ধ্যান। যত আমি ও তিনি একাত্ম হইব, তত সমস্যা এই একাত্মতার ভাবে ও রসে গলিয়া যাইবে। ঠাকুর, তোমার জয় হউক। রেণু ১২৷ টার পর বাহির হয়, ফেরে ৬৪.টায়। হেমাঙ্গবাবু ২০০৲ টাকা দিয়া যান। প্রণব আসে ৭৷. টার পর। বিবেকানন্দের একটী বক্তৃতার (মাঘ মাসে বাহির হইয়াছে) শেষাংশ পড়া হয়। তাঁহার দর্শনে জড়-অজড়ের সমন্বয় হয় নাই—প্রচলিত শঙ্কর দর্শন। অথচ তাঁহার বক্তৃতায় আছে বর্তমান যুগ-দর্শন, নিতাগোপাল দর্শন ১৯শে জানুয়ারী

নেমেই নীচ বর্ণের ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলে তার শুচিতা হানি হবার ভয়ে? এর পেছনে সেই কথা—সত্ত্বগুণ ব্রহ্মলাভ তথা উচ্চ জীবন লাভের একমাত্র পথ এবং সত্ত্বগুণের মধ্য দিয়ে ছাড়া ব্রহ্মলাভের কোন উপায়ই নেই।

সত্ত্ব রজো তমো গুণের ক্ষেত্রে এই উচ্চ-নীচ বিভাগদ্বারা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বা হেয় উপাদেয়-র সিঁড়ি-ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্যই ঐ সমস্ত গুণাধিকারীও সেই অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট আসন পেয়ে বসে আছে। তাই যদি মানুষের মধ্যে ছাপ মেরে দেওয়া এই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিধি-ব্যবস্থা উল্টাতে হয় তাহলে মূলে সত্ত্ব রজো তমো গুণকেও ঐ ভাগে ভাগ করার ধর্মীয় তথা দার্শনিক ব্যবস্থা উল্টাতে হবে। জানতে ও মানতে হবে যে প্রত্যেক গুণ তার তার ক্ষেত্রে অনন্য এবং প্রত্যেক গুণের সঙ্গে ব্রহ্মলাভ বা উচ্চ জীবন যাপন direct ও equal সম্বন্ধে সম্বন্ধ— কারো মারফতে আসার দরকার নেই। সত্ত্বগুণদ্বারা যদি ব্রহ্ম লাভ হয়, তমোগুণদ্বারাও অবশ্য হবে—কিন্তু কোনটা দ্বারাই হবে না যদি তা বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবাবুদ্ধিতে ও তাদেরই প্রীত্যর্থে না হয়ে নিজের অহমিকা-প্রসূত হয়। এর পরের কথা হচ্ছে প্রতিটি গুণ জীবন্ত জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সত্তা এবং প্রয়োজনীয়—তাদের উচ্চ নীচ বিধান একেবারেই মানব দেহ মন প্রাণ অর্থাৎ তার সমগ্র সত্তার বিজ্ঞানের বিরোধী। প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিটি গুণ রয়েছে এবং তা বিকশিত করে তুলতে হবে সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। এইটেই মানব দেহ-মনবিজ্ঞান, এবং এইজন্যই এই গুণবিভাগ কখনই জন্মগত হতে পারে না। জন্মগত স্বভাবে কারো মধ্যে একটা বেশী আর একটা কম থাকা অবশ্যই স্বাভাবিক কিন্তু তাতে উচ্চ নীচভেদের প্রশ্ন আসতে পারে না যখন প্রতি গুণেরই নিজস্ব অনন্যতা ও জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য সত্যতা রয়েছে।

মূলে গুণের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা প্রস্থাপিত হলে মানুষে মানুষে ভেদ দূর করা সম্ভব হবে। নইলে সত্ত্বগুণ উচ্চ স্তরের, তমোগুণ নীচু স্তরের এ গোড়ায় মেনে নিলে সেই সেই গুণাধিকারীর মধ্যের ব্যবধানকে—ভেদবাদ ও তার ফলে ঘৃণা বিদ্বেষকে—দূর করার কোন উপায় নেই। সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিটি গুণ নিয়ে মানুষ মাত্রই বিকশিত হয়ে উঠবে—মানুষের কাছে এই চিন্তাধারা প্রস্থাপন করাটা প্রথম কাজ— তখন হরিজন তথা নিম্নবর্ণকে নিগ্রহ করো না বলার দরকার হবে না— আইন তখনই কার্যকরী হবে—নইলে ঘরের মধ্যে কি পুলিশ বসানো যায়? আইন করে কি হৃদয় পরিবর্তন করা যায়, ঘৃণা— যুগ যুগান্তের ঘৃণা—দূর করা যায়? উপরি উক্ত চিন্তাধারাই শুধু আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের ঐ রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

WANTED AGENT

Wanted Agents (Male Female)
Candidates do this work at own Area)
Salary Rs. 300/-. Commission and T. A. extra.

Qualification :- Candidate should be minimum Matric or Higher Secondary. Age 16 to 45 yrs.

Send applications only in Hindi or in English.
Registered letter at following address :-

GWALIOR TEXTILES,
38-B, Majlis Park.
DELHI-110033.

সাফল্য শীর্ষে

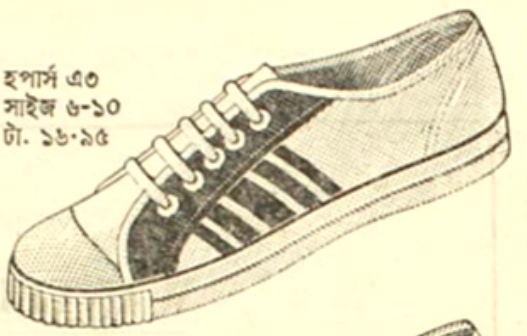

হপার্স এ৩
সাইজ ৬-১০
টা. ১৬·৯৫

স্মার্ট ১৪
সাইজ ২-৫, ৬-১০
টা· ১৫·৯৫,
১৮·৯৫

পি পি ফ্ল্যাশ এ৫
সাইজ ৬-১০
টা. ৩৪·৯৫

পাওয়ার কোর্ট এ৬
সাইজ ৫-১০
টা. ৪২·৯৫

Bata

খেলাধুলোর জুতো

২৪ পরগণায়—

দুঃসহ গ্রামীণ বেকারদের কর্ম সংস্থানে—
বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ।

—খাদ্যের বিনিময়ে "কাজ"—কর্মসূচী

বেকার শ্রমিকরা পেয়েছে—

১৪ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমদিবসের কাজ

১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা

২৯ হাজার কুইন্টাল গম

সরকারী পর্য্যায়ে এই প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হতে চলেছে ২৮৭৪টি প্রকল্প।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

গীতাবাণী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য রহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সন্নিবেশিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। বৃহদ্বয় আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ জ্যাকেটসহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সহ ১২·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাঙালাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাঙালাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে "—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদ্য পাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	২·০০		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম		ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
কবিবাণী		Soul of India speaks	৭·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৯·০০	বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০	বাংলার ঋষি	৭·৫০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
আচার্য জগদীশ	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৯·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ বি টি

ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৩·০০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিদ্যাসাগর	৩·০০		

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·০০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

এ সি ডি সি লা ই ব্রে রী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be reovolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (সূচীপত্র)
২য় খণ্ড (১ম অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও জীবনে
স্বরাজের পূর্ণরূপ
গীতাজয়ন্তী
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১৮০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

॥ ৺ প্রতিভা রায়ের ॥

নারী-প্রগতির অন্তরায়
২ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল চক্রবর্তী ও শিষ্যানুগার কথা
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

সমন্বয়মূর্ত শ্রীনিতাগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্ন
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
৪। রবীন্দ্র হৃদয়
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম (বাগুইআটী, অবিনীনগর, (ডায়া - দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী পোঃ অবিনীনগর কলিকাতা ৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o ন, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত

নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী।

" নমঃ-অনিত্য নমঃ আমা-অনাত্ম নমঃয়।

জ্ঞান-অজ্ঞান নমঃয়। আকার-নিরাকার

'আমি বিশ্ব-নাগরিক নমঃয় আকার-নিরাকার নমঃয়। এই বিশ্বই আমার মহামঠ'

আকার-আকার-নিরাকার নমঃয়।

জ্ঞান-অজ্ঞান নমঃয়। চৈতন্য-

অচৈতন্য নমঃয়।

চৈতন্য নমঃয়।

সব নমঃয়"।

সম্পাদিকা— রেণু মিত্র

আবেদন

নরনারায়ণ আশ্রমের সুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন জানাই যে, বাগুইআটি গ্রামে আশ্রমের বাইশ বৎসর অতিবাহিত হইল এখনও ইহার চতুর্দিকের সীমানার দেওয়াল দেওয়া হয় নাই। গত বৎসর ডঃ আম্বেদকরের ৪০০০৲ টাকার দানে উত্তর দিকের দেওয়াল হইয়াছে, পাঁচজনের দানে পশ্চিম দিকের দেওয়াল হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্বের কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই, অতএব তাঁহারা যদি যিনি যাহা পারেন সাহায্য করেন তাহা হইলে এই কাজটী হইতে পারে। দক্ষিণ পূর্বের সবটুকু ব্যবস্থা করিতে অনুন ১৫(পনের) হাজার টাকার প্রয়োজন। আশ্রমের সকল সুভানুধ্যায়ীর নিকট আমাদের এই আবেদন ফলপ্রসূ হইবে ইহাই বিশ্বাস করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

সম্পাদিকা

নরনারায়ণ আশ্রম

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৮

মহৎ আবির্ভাব—শ্রীনিত্যগোপাল

—ইন্দ্রেণু মিত্র

মহৎ আবির্ভাবকে কি আমরা বুঝতে পারি? পারি না। মুখস্থ করা পথে চলতে আমরা অভ্যস্ত, নূতনকে দেখলে চিনতেও পারি না, চিনলেও স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। কেননা অপরকে স্বীকৃতি দিতে অনেকখানি জীবত্বের ঊর্দ্ধে উঠতে হয়। জীবের স্বভাব অপরকে অস্বীকার করা— বিরোধীতা করা। জীব দল বোঝে—এক দলের পরস্পরের মধ্যে তাদের ঐক্যের অভাব নেই। কিন্তু দল-নির্বিশেষে, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলকে স্বীকার করে নেওয়া, যে কাউকেই পেয়ে আনন্দিত হওয়া এটা জীবের স্বভাব নয়। একটি গরু অপরিচিত অর্থাৎ তার দলের বাইরের একটী গরুকে দেখে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাল, খুশী তো হলই না। যতক্ষণ সে গরুটী দূরে চলে না গেল ততক্ষণই প্রতিবাদ জানাল। এটা জীবের স্বভাব— মানুষ যতখানি জীব ততখানি সে-ও ঠিক এই রকম। চিন্তাবিদ আবু সৈয়দ আয়ুব লিখছেন, 'শতকরা ৯৫ জন মানুষ যদি মূঢ়, দুর্বৃত্ত, হিংসাপরায়ণ হয়, তবে সেটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো গেরিলা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির নিকট আত্মীয় ছিল।....' কাজেই মানুষের মধ্যে যখন অপরকে সহ্য করতে না পারা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির প্রকাশ দেখি তখন আশ্চর্য না হওয়াই উচিত। মানুষের জীবত্ব যেমন অপরকে স্বীকৃতি দিতে পারে না তেমনি নূতনকে চিনে নিতেও পারে না। শ্রীঅরবিন্দ আরও লিখছেন, 'কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক, মূলতঃ পদার্থবৈজ্ঞানিক নিয়মে চালিত এই বিশ্ব জগতে মানুষের—যুক্তি নির্ভর, ধর্মাধর্ম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হল কি করে?....একজন সক্রেটিস, যীশুখ্রীষ্ট, গৌতম বুদ্ধ, শেক্সপীয়ার বেটোফেন, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার পরিধির মধ্যে আবির্ভাবটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার।....' তাই বলি মহৎ আবির্ভাবকে চিনতে পারা ও স্বীকার করা, পরম আশ্চর্যকে মেনে নেওয়া সহজ নয়, তাতে জীবত্বের ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্বের স্তরে উঠতে হয়। সেদিনের পরিবেশে সক্রেটিসকে যেমন আমরা নেই নি, নেই নি যীশুখ্রীষ্টকে, তেমনি আজকের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকেও নেই নি।

পরিচিত পথে দেখতে শুনতে চলতে অভ্যস্ত আমাদের মন তাই বর্তমান কালের আর একটি মহৎ আবির্ভাবকে চিনে নিতে পারছি না। শ্যামিক হতে হলে কি কি তার রূপ সে সম্বন্ধে আমাদের

মনে একটা মুখস্থ করা চিত্র আছে। কিন্তু সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল—যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত—যখন তাঁর ছুরন্ত-গলানো মূর্তি নিয়ে একদিকে মুহুর্মুহু সমাধি ও আর এক-দিকে সহজ স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত ব্যবহার নিয়েও বলেন 'আমি বিশ্ব-নাগরিক' কিংবা 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ', তখন আর তাঁকে কেউ বুঝল না। মানুষ হয় সমাধি বোঝে—যেখানে কেউ নেই—বিশ্ব নেই; নয় বিশ্ব নিয়ে মাতামাতি বোঝে। কিন্তু এ কি? এইমাত্র দেখি একটি নিষ্পন্দ মূর্তি কোন্ অতলে হারিয়ে গেছেন, আবার যখনি দেখি সেই মানুষটি সর্ব ব্যবহার-নিপুণ কুশলী জীবন-বক্তা। জীবনকে যিনি এতটুকুও অস্বীকার করেন নি। মানুষের অভ্যস্ত পথে চলা মন বলল, —কিছু বোঝা গেল না।

কিন্তু সত্যি পরম বিস্ময়-উদ্রেককারী এই মহৎ আবির্ভাব। বন্ধুবর শ্রীঅয়ুব ঠিকই বলেছেন, '...একজন শিশুর রোগ-যন্ত্রণাজনিত কান্না যেমন মঙ্গল বিধানে আমাদের বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়, তেমনি একজন মহামানবের আবির্ভাব কি প্রাকৃতিক নিয়মের জালকে ছিঁড়ে ফেলে না? প্রাকৃতের আড়ালে অতি প্রাকৃতের ইঙ্গিত বহন করে আনে না? অন্ততঃ আমাদের মনের ভাবকে বিস্ময়ে অবাক করে দেয় না কি?'

হ্যাঁ, দেয়—আরও বেশী দেয় যখন দেখি প্রকৃতির মধ্যে সে আবির্ভাব অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিতই শুধু বহন করে না—প্রাকৃত অতিপ্রাকৃত দুটো তার জীবনে মিলে মিশে এক অভিনব সত্তাকে প্রকাশ করে। শ্রীনিতাগোপাল সেই অভিনব সত্তা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যেখানে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত, স্বার্থপরতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কর্তৃত্বলাভ-প্রচেষ্টায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, তারই মধ্যে 'চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়' রূপ নিয়ে প্রেম-স্বরূপতার স্বভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীনিতাগোপাল। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের বাসন্তী অষ্টমী তিথি—যা পড়ছে ১৩৮৪-র ১লা বৈশাখের দিনটিতে—শ্রীনিতাগোপালের ১১৪-তম জন্মতিথি। বাঙলার আকাশ বাতাসে, বাঙলার কৃষ্টির অনুকূল পরিবেশে ৪৯১ বৎসর পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের তত্ত্ব পরিণতি লাভ করল বাস্তব বাস্তবাতীত, প্রাকৃত অতিপ্রাকৃত, বিজ্ঞান মিষ্টিসিজম সমন্বিত শ্রীশ্রীনিতাগোপালে। বিপরীত তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গী হয়েই তাঁকে দুর্বোধ্য করেছে বটে—তবু সেখানে বর্তমান যুগের বহু সমস্যারই সমাধান মেলে। তাই তিনি আজ অনুধাবনযোগ্য। যুগধর্মানুযায়ী সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের আকৃতি স্পষ্ট অস্পষ্ট নানাভাবে আজ প্রকট। সত্যের দুই দিকই আজ যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভে ইচ্ছুক—স্থিতি যদি সত্য, গতিও তাহলে সত্য; নিত্য যদি সত্য, অনিত্যও সত্য; নিরাকার যদি সত্য, আকার নিশ্চয়ই তার দাবী পেশ করবে; সান্ততা যদি সত্য, ক্ষণকেও অবশ্য সত্য বলতে হবে,—এমনি সব বিপরীত সম্বন্ধেই। এতদিন পর্যন্ত মানুষ এর কোন একটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকেই একান্ত সত্য করে নিয়ে, অপর পক্ষের সঙ্গে লাঠালাঠি করেছে। আজ যুগের চিন্তা বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হল প্রত্যেকটা দৃষ্টিভঙ্গি আপেক্ষিক এবং দুইয়ে মিলেই সত্যের সমগ্র

রূপ। তাই শ্রীনিতাগোপালে হেগেল-মার্ক্স-এর সম্মিলন পাওয়া যাবে। যে কোনও এক রকমের ভাবনার মধ্যে আটকে যাওয়া মানুষের একটা স্বভাব, কিন্তু এমন মানুষও অজ্ঞান যারা দুই বিপরীতমুখী চিন্তাকে প্রাণের মধ্যে, জীবনের মধ্যে দুইয়ের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেও এক করে পান—শ্রীনিতাগোপাল তেমনই একটি আবির্ভাব। ঐ দুইয়ের কারোরই অস্তিত্ব ও আস্বাদন শ্রীনিতাগোপাল তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায় না কেবল তাদের উভয়ের মধ্যে যে পরস্পর পরিপূরকতারও স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ছিল, সেইটার স্ফুরণ হয় মাত্র।

এ বিশ্বে যে কোন দুইটি বস্তু ভাব ঘটনা বা অবস্থাকে আমরা পরস্পর 'বিরুদ্ধ' বলে বুঝতাম, তারা যে পরস্পর পরিপূরকও, এইটে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। আত্মা অনাত্মা, জড় অজড়, চৈতন্য ও চৈতন্য, বিশ্ব বিশ্বাতীত, নর নারী, রাজা প্রজা, ধন শ্রম সবই বিরুদ্ধও বটে, পরিপূরকও বটে। কিন্তু সেই কথাটা মনে রাখতে পারে না বলেই একদল মানুষ বলেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আর এক-দলের কেউ বলেন জগৎই সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা; আর কেউ বলেন ব্রহ্ম থাকুন বা না থাকুন জগৎ আছেই, জগৎ সত্যই; কেউ বলেছেন জড় থেকে চৈতন্য সৃষ্টি, কেউ বলেছেন চৈতন্য থেকে জড়। শ্রীনিতাগোপাল-মতে হয় এদের দুইটিই সত্য, নয় তো কেউ-ই নয়। এ জগৎ মায়ামোহ মিথ্যা, এর পারমার্থিক মূল্য কিছুই নেই এই কথাই ভারতবর্ষে প্রবলতর হয়ে সবাইকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে উপায় যখন নেই, যতদিন কর্মভোগ আছে ততদিন 'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন' সেইভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই ভাবে ভুগতে ভুগতে অভ্যস্ত ভারতবাসীর কাছে আজ শ্রীনিতা-গোপালের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লেখা নূতন জীবন-দর্শন উপস্থিত করতে হবে। বিশ্বের সত্যতা সম্বন্ধে শ্রীনিতাগোপাল লিখছেন, 'আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই বিশ্বকে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সত্যই বলিতে হইতেছে। এই বিশ্ব দর্শন স্পর্শন এবং বোধদ্বারা অবধারিত হইতেছে'। শ্রীনিতা-গোপালের এই বিশ্ব-সত্তার জীবনদর্শন সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর 'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে' গ্রন্থের ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় লিখছেন, শ্রীনিতাগোপাল আত্মাকে একান্ত 'নিত্য সত্য' এবং অনাত্মাকে একান্ত 'অনিত্য অসত্য' ধরিয়া লইয়া বিশ্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াটাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছেন। নিত্য অনিত্য সত্য অসত্য সবই আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। আত্মা বা অনাত্মা কিছুই absolute নিত্য বা অনিত্য নয়, সত্য বা অসত্য নয়। শ্রীনিতাগোপাল আত্মার মধ্যে অনিত্য অনাত্মার অব্যক্তভাবে থাকার অনাত্মার মধ্যেও অব্যক্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া-ছেন। তাঁহার মতে নিত্যের মধ্যে অনিত্য এবং অনিত্যের মধ্যে নিত্য অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। আত্মা নিত্য সত্য, আত্মা অনিত্য অসত্য এবং অনাত্মা অনিত্য অসত্য, অনাত্মা নিত্য সত্য— দুইকেই লীলার বিবর্তনে বর্তমান বিশ্ব আস্বাদন করিবে। 'অনিত্য তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে।' —রবীন্দ্রনাথ। ইহাই

শ্রীনিত্যগোপালের নিত্যানিত্য সমন্বয়। এই তত্ত্ব আস্বাদন করাইবার জন্য 'তিনি রজ্জুতে সর্পভ্রম' 'মরুভূমিতে মরিচীকা' দর্শনকে চালেঞ্জ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'সর্প আছে তাই রজ্জুতে সর্পভ্রম কখন কখন হইয়া থাকে। সর্প যদি না থাকিত তাহা হইলে কখনও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইত না। অসত্য আছে তাই সত্যে অসত্যের ভ্রম হয়। অসত্য যদি না থাকিত তাহা হইলে সত্যে অসত্যের ভ্রমও হইত না'। 'জলেরই রূপান্তর তুষার যেমন, তদ্রূপ প্রকৃতিরই রূপান্তর পুরুষ। তুষারেরই রূপান্তর জল যেমন, তদ্রূপ পুরুষেরই রূপান্তর প্রকৃতি। পুরুষও যাহা, প্রকৃতিও তাহা, উভয়ই আত্মা' শ্রীনিত্যানন্দ পত্রিকা।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের সুবিশাল ক্ষেত্রে যেখানেই ব্যাখ্যাতারা তাদের গণ্ডীবদ্ধ করে ঐকদেশিক করে ফেলেছেন, শ্রীনিত্যগোপাল সেই খানেই আঘাত হেনেছেন, তাই বললেন, 'পুরুষও যাহা, প্রকৃতিও তাহা, উভয়ই আত্মা; কিংবা আত্মা নিত্য সত্য, আত্মা অনিত্য সত্য, অনাত্মা অনিত্য অসত্য, অনাত্মা নিত্য সত্য ইত্যাদি।

শ্রীনিত্যগোপাল ভক্তও ভগবানও—সর্বোপরি তিনি প্রেম-স্বরূপ। তাঁর এই প্রেম স্বরূপতা তাঁর দৈহিক রূপলাবণ্যে যেন সদা ক্ষরে পড়ত। শান্ত সমাহিত অপরূপ এই মানুষটী একদিকে মুহুর্মুহু নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়ছেন, অপর দিকে প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখে অংশ গ্রহণ করছেন। মানুষকে ভালবাসতে গেলেই আসক্তি বিদ্বেষে ভরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা; সেইটে হয় না তাঁর যিনি মানুষকে ভালবাসা সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থও হতে পারেন অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনাকে transcend করতে পারেন। এটা শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে অত্যন্ত সহজ ছিল বলেই তিনি এত সুন্দর। সব মানুষকে, সব ঘটনাকে স্বীকার করে, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েও তিনি সব মানুষ ও ঘটনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন তাই তিনি যেমন মধুর তেমনি মহান।

মানুষকে স্বীকার করলেই সমগ্র মানুষকে স্বীকার করতে হবে—সব দেশের সব কালের সব জাতির সব মানুষ। আমার পূর্ণ পছন্দমত আমি একজন পাঁচজন বা একদলকে স্বীকার করব আর সকলের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাতে বিশ্বকে স্বীকার করা হয় না। সেই জন্যই নিত্যগোপাল বলে রেখেছেন এই বিশ্বই আমার মহামঠ, আমি বিশ্বনাগরিক। সকল কালের সকল জাতির সকল দেশের সকল ধর্মের সকল মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে হবে, তাহলেই বিশ্ব মহামঠ হতে পারে। সবকে ভালবেসেও সবকে ছাড়িয়ে যাবার একটি জীবন্ত চিত্র শ্রীনিত্যগোপাল। এ জীবন-চেতনার তাগিদ আজ সকলের অন্তরে, তাই শ্রীনিত্যগোপালকে আজ বড় প্রয়োজন। শ্রীনিত্যগোপাল যখন এসেছিলেন তখনও মানুষ খণ্ড চিন্তা খণ্ড ব্যবহারে আঁকড়ে থাকতেই ভালবাসত তাই শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝতে পারা তখন একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাই স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীনিত্যগোপাল বলেছিলেন, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব'। তাই গিয়েছিলেন তিনি; কিন্তু ১০০ বছর পরের লোকের তাঁকে বুঝতে পারার দরকার আছে

সে কথাও জানতেন বলেই শ্রীনিতাগোপাল জাতি দর্পণ, সিদ্ধান্ত দর্শন, ভক্তিযোগদর্শন, বিবিধ তত্ত্ব প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ লিপে রেখে গেছেন এবং প্রচার বা লোক সংগ্রহ একেবারে না চাইলেও নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন তিনি যেখানেই দেহ রক্ষা করুন না কেন কলকাতার বাগিগঞ্জেই তৎ-প্রতিষ্ঠিত মহানির্বাণ মঠে যেন তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এ সব ঘটনায় এইটেই বোঝা যায় যে শ্রীনিতাগোপাল তাঁর তত্ত্ব-জীবন ভবিষ্যৎ কালের জন্যই রেখে গিয়ে ছিলেন। চারদিকে তাকালেও রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্য-পরবর্তী কাল পর্যন্ত পরিবেশের যে প্রতিফলন দেখা যায় এবং দেশ বিদেশের রাষ্ট্রনীতি গত পঞ্চাশ বৎসরে যেখান থেকে যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে শ্রীনিতাগোপালের সমন্বয় ধর্মের সার্বগ্রহ জীবনবাদ আজকের দিনের মানুষের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হয়েছে। ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে হবে আবার মানুষ তার জাতি, সম্প্রদায় বা দলের মধ্যেই আটকে থাকবে না—সর্ব জাতি, সর্ব সম্প্রদায় ও সর্ব দলের সঙ্গে কণ্ঠলগ্ন হয়ে এক-বিশ্বে এক মহারাস-ক্ষেত্র রচনা করে তুলবে—এই-ই তো মাতৃযী সত্তার কথা এবং এই কথাই শ্রীনিতাগোপাল তাঁর জীবন ও তত্ত্ব দিয়ে বলে গেছেন। আমাদের এই কথাগুলি শুনতে বুঝতে হবে, নিজেদের জীবনে আচরণ করতে হবে এবং আচরণ করে মানুষের কাছে উপস্থিত করতে হবে। আজকের দিনে সেটা প্রধান সমস্যা সেটা হচ্ছে চিন্তাধারার দৈন্যের চেয়েও আচরণের দৈন্য, সত্তার দৈন্য। আমরা যা বলি তা আমরা করি না, আমরা যা নই নিজেদের সম্বন্ধে তাই আমরা প্রচার করে বেড়াই। এই সত্তার অভাব আমাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে এসেছে, আরও নিয়ে যাবে। এই মিথ্যাচার থেকে বাঁচাতেই শ্রীনিতাগোপাল বলেছিলেন, 'আমায় ফেরি করো না'। ফেরি করতে গেলে বস্তুর যে মূল্য তার থেকে অধিক মূল্য ঘোষণা করে বস্তুকে চালাতে হয়। অসত্যের এই বীজ গোড়ায় শ্রীনিতাগোপাল নষ্ট করতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, যা আচরণ করবে তাই প্রচার করবে। আজ শ্রীনিতাগোপালের ১১৫ তম জন্মদিনে আমরা তাঁর এই তত্ত্ব ধ্যান করি, সংকল্প গ্রহণ করি এই তত্ত্ব নিজের জীবনে আচরণ দ্বারা বিশ্ব জুড়ে মহারাস-ক্ষেত্র রচনা করে তুলতে।

শ্রীশ্রীনিতাগোপালের এই তত্ত্ব-জীবনের ব্যাখ্যা রেখে গেছেন ঈশ্বর পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁর ব্রহ্মসূত্র, ১১ খানা প্রধান উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য এবং 'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে' গ্রন্থে। শ্রীনিতাগোপালের এই অভিনব জীবন-দর্শনে ভক্ত-ভগবান সম্বন্ধ, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সবই নূতন রূপে উদ্ভাসিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দর্শনে ও জীবনে গ্রন্থে ঈশ্বর পুরুষোত্তমানন্দ লিখেছেন, 'ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাধনা-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ একটি যোগসূত্র রহিয়াছে, যাহার ফলে সাধনা-শক্তির সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায় পরকীয়। ভক্তের ভগবানকে পাওয়া সাধনার ফল নয়। ভক্ত ভগবানকে সহজ ভাবেই অসাধনে পাইয়া আছে। ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিতান্ত সহজ বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হয়।

সাধন-নিরপেক্ষ ভক্ত ভগবানের এই সহ-

সহজের উপর দাঁড়াইয়াই শ্রীনিতাগোপাল সব সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন। এতদিনের সাধনা আরম্ভ হইয়াছে জীবের বিচ্ছিন্ন 'আমি' হইতে, যে আমির কাছে আমি ও ভগবান পৃথক্-ভূত। ভক্ত-ভগবানের এই পৃথক্ভূত সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়াই কর্ম-সাধনা জ্ঞান-সাধনা ভক্তি-সাধনা ও যোগ-সাধনা প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে কর্ম জ্ঞান ভক্তি যোগও পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িল এবং সর্ব সাধনাই সত্য স্তরে রহিয়া গেল। এইভাবে কর্মী জ্ঞানী ভক্ত যোগী পরস্পর বিরুদ্ধ পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল; ইহার ফলে সর্বসাধন সমন্বয়, সর্বসিদ্ধি সমন্বয়, সর্বসাধক সমন্বয় অসম্ভব হইয়া রহিল। শ্রীনিতাগোপাল আসিয়াছেন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সহজ নিত্য-যুক্ততার উপর দাঁড়াইয়া সব সাধন সমন্বয় সর্বসিদ্ধি সমন্বয় সর্বসাধক সমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিবার জন্য'। পৃঃ ৮৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আরও লিখেছেন, 'তাঁহার অযাচিত করুণায় তিনিই আমার চান; আমি তো সদাই তাঁহাকে চাহি না। 'তোমার খুশী চেয়ে আছে আমার খুশীর পানে'। আমার প্রতি তাঁহার এই আকুল দৃষ্টিকে ধরিয়াই তাঁহাকে চিনিতে হইবে, তাঁহাকে চিনিতে চিনিতে আমিকে ও আমার বিশ্বকে চিনিতে হইবে। বিশ্ব কি যেমন তেমন সত্য? বিশ্ব যে তাঁহারই মত নিত্য সত্য। কত তপস্যার ধন এই জগৎ ও আমি। 'সঃ তপস্তপ্ত্বা ইদম্ সর্বমসৃজত'। যে তপস্যায় আমি জাত, সেই তপস্যার সূত্র ধরিয়াই না প্রবর্তিত হইবে আমার সাধনা? নারায়ণে আমাকে 'চান'। তাঁহার এই চাওয়াকে সার্থক করিয়া তোলাই হইবে আমার সাধনা। নরই নারায়ণের ইষ্ট।' পৃঃ ৯০

শ্রীনিতাগোপালের সামগ্রিক জীবন-দর্শন এবং তদুপযোগী সাধন-সাধনার নরই নারায়ণের ইষ্ট, ভগবান ও আমি পৃথকভূত নই এই ধারণা হইতে সাধনার আরম্ভ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন। তাই এখনও সর্বসাধারণের কাছে তিনি পরিচিত নন। দীর্ঘকাল মানুষকে শেখানো হয়েছে সে পাপী, অজড় অমর অনির্বচনীয় শ্রীভগবানের সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান—অপতপত্রতমানযান করে পুণ্যাত্মা হতে হয়। কিন্তু শ্রীনিতাগোপাল-মতে ভক্ত ভগবান অপৃথক্‌কৃতা—সাধা জীবন ধরে কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেমের বিভিন্ন পথে এই অপৃথক সত্তাই আস্বাদন।

কাজেই প্রচলিত এত দিনের পথ থেকে শ্রীনিতাগোপাল অনেক এগিয়ে গেছেন তত্ত্বে ও আচরণে—তাই তিনি আজও অপরিচিত। তবু তাঁকে প্রয়োজন আছে। আজ তাঁর এই ১২৫ তম জন্ম-ক্ষণে আমরা তাঁকে বুঝতে চাই, তাঁর মত আচরণ করতে চাই। বিশ্ববাসী সকলের সঙ্গে মিলনের পথ তিনি এঁকে গেছেন, আমরা সেই পথে যাব তাঁর সাথে।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বন্দনা

—শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

হলে সমাজ জীবন জীর্ণ
বৈকুণ্ঠ ছেড়ে হন শ্রীহরি অবনীতে অবতীর্ণ ;
করাতে ধরায় অমৃত বৃষ্টি
জাগাতে তোলেন প্রাচীন কৃষ্টি
দিকে দিকে ফোটে নতুন সৃষ্টি, কুসুমে কুসুমাকীর্ণ।

পল্লী বাংলা বক্ষে
নিত্যগোপাল নেমে এলে তুমি সকলের অলক্ষ্যে
পানিহাটী মাটি করি স্নিগ্ধপূত
জনমজনের সাজি নবসূত
লক্ষ জনেরে বাঁধ অদ্ভুত প্রেম-মৈত্রী-সখ্যে।

তপ্ততে কনক কান্তি
অনঙ্গ কিংবা নদীয়ার চাঁদ জনমনে মহাভ্রান্তি :
আনন্দ সেদিন নিখিল গৌড়ে
কোলাকুলি করে জড় ও অজড়ে
অণু-পরমাণু হরষে শিহরে নিখিল প্রাণেতে শান্তি

বিকৃতি লীলা রঙ্গে
ক'রেছ কত না আত্মীয় স্বজন ভক্ত শিষ্য সঙ্গে :
সাজ নবদ্বীপে শচীর দুলাল
মহিলার পাশে শ্রীবাল গোপাল
উইলিয়মে দেখাও ইষ্টদেব তার খৃষ্টে আপন অ

যারা নিতি নিরানন্দ
জাগাতেছ তুমি তাদের জীবনে উজীবনের ছন্দ
পাপী তাপীদের দাও স্নেহছায়া
পতিতা গোলাপের তরে কত মায়া
বাঁচাও নিশীথে প্রিয়লাল আমা, তুমি যে সত্যসঙ্ঘ।

মমতামাখানো দৃষ্টি
নশা ছারপোকার প্রতিও তোমার ঝরে কত সুধা বৃষ্টি
অনুপম তুমি প্রেম বিতরণে
খেয়েছ অন্ন সরমের সনে
করেছ সত্য সাধক জীবনে নব ইতিহাস সৃষ্টি।

তুমি কল্পতরু তুল্য
তব শ্যামছায়ে কত না পান্থ হয়েছে শীতল ঘুম
ভ্রাতা, অভ্রাত, অস্পৃশ্য জাতি
মধু পরিবেশে কাটি দিবারাতি
অভীষ্ট ফল পায় প্রাণপাতি, লভে জীবনের মূল্য।

মেদিনী স্বার্থে মত্ত
সমন্বয়ের বাণে না তো সুর নেই প্রাণের নিরাপত্তা
মগ্ন সবাই ক্লেদ আবর্তে
তুমি নিয়ে চল আলোক বর্ত্তে
তত্ত্বমূর্ত্তি, আন গো মর্ত্তে শিব সুন্দর সত্য।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৬

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এক আমেরিকার বক্তৃতায় (এই মাসের উদ্বোধনে বাহির হইয়াছে) বলিয়াছেন যে, সংসার ও ভগবান একসঙ্গে থাকিতে পারে না আলো আঁধারের মত। তাঁহার মতে সমস্ত ধর্ম ও মহাপুরুষগণ এই মতবাদেরই সমর্থক। শ্রীনিতাগোপালের কৃপায় আমি কিন্তু ইহা অন্য রূপ বুঝিয়াছি জড় অজড় আলো অন্ধকার একই সঙ্গে আছে; জড় অজড়ের মধ্যে আছে gradualness, vagueness ও halftone। The law of excluded middle বর্তমান যুগে অচল। শ্রীনিতাগোপাল বিশ্ব-সত্যতার ধারা বদলাইতে আসিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যেমন জল বরফ হয়, বরফ জল হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষ হন, পুরুষ প্রকৃতি হন। ইহারা foreign নন। ইহাদের মধ্যে আছে একটি natural organic process যেমন $E = Mc^2$। Spirit হইতেছে matter, matter হইতেছে spirit। Spirit-এর matter হইতে কোনও অনির্বচনীয় তৃতীয় শক্তির শরণ নিতে হয় না। পুরুষ প্রকৃতি দুই মিলিয়াই এই সৃষ্টি রচনায় সক্ষম। এইখানেই শ্রীনিতাগোপাল পরম ও চরম দর্শন ও জীবন দিয়া গেলেন। এখনও নিতাগোপালের যুগ ঠিক ঠিক আরম্ভ হইতে দেরী আছে। তাঁহার টান এখনও বেশ চলিতেছে। ভিতরে ভিতরে জোয়ার আসিয়াছে বটে। জয় নিতাগোপাল। রেণু ১৯ টার পূর্বে বাহির হইয়া গেছে ৪॥. টায় পর। রেণুর প্রকৃত কল্যাণকামী, স্নেহপরায়ণ হরিদাস ভট্টাচার্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যক্ষ ছিলেন) ৯ টার সময় তাঁহার বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। Freelance এ খবর পাই সন্ধ্যার পর। বেদনাদায়ক সংবাদ। রেণুর এবারকার reviewer হওয়া তাঁহারই প্রচেষ্টায় হইয়াছে। কেমন করিয়া রেণু দুটি পয়সা পায়, তাহার দিকে কি তাঁহার সতত দৃষ্টি। আদর্শবাদিনী রেণুকে কি স্নেহই না তিনি করিতেন, তাঁহার মত বন্ধু জীবনে আর মিলিবে কি না সন্দেহ। রেণু একজন সত্যিকার বান্ধব হারাইল। ৮॥. টার পর প্রণব আসে। ২০শে জানুয়ারী

স্বামী বিবেকানন্দ যাহা দীর্ঘদিন পূর্বে বলিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ এই সেদিন তাহার বিপরীত দর্শন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ যেখানে পুরুষোত্তম-স্তরে গিয়া সেখান হইতে অবতরণ করিয়া (পুরুষোত্তম-সাযুজ্য লাভ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে) এই বিশ্বের দিব্য রূপান্তরের কথা বলিয়াছেন, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ অক্ষরধাম এই প্রকৃতির রাজ্য হইতে অনন্তে গিয়া পৌঁছানোকেই চরম বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে বিশ্বের দিব্য রূপান্তর বিধানের কোন স্থান নাই। ইহা একবারেই শঙ্কর দর্শন। তবে তিনি বিশ্ব মানবের সঙ্গে মুক্তি আস্বাদনের কথা 'উপায়' স্বরূপ বলিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইতেছে প্রকৃতি

হইতে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। প্রকৃতি পুরুষের, মায়া ব্রহ্মের সম্বন্ধের গন্ধও ইহাতে নাই। অথচ শ্রীনিতাগোপাল ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ইহার সবটুকু বলে নাই। জীবের ascent ও পুরুষোত্তমের descent পৃথক ভাবে স্বীকার করিলে মনের স্তর হইতেই তাহা সম্ভব হয়। যেখানে মন বুদ্ধি লয়, সেখানে ascent descent দুই ই যুগপৎ। আমি যত খানি প্রকৃতিকে 'আত্মা' বলিয়া জানিব, তত খানিই আমার আত্মজ্ঞান ঘন হইবে। যত আমি ব্যাপক, ততই আমি গভীর। প্রথম হইতেই বিশ্বকে, প্রকৃতিকে সঙ্গে রাখিয়া আমি ascend করিব। শ্রীনিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন। সীমানা পুনর্বিন্যাসের দাবীতে আজ হরতাল। প্রায় ৯টায় ডাঃ মুখার্জী আসেন, প্রায় ১০ টায় যান। রেণুকে তাঁহার নার্সিং হোমে ৭।৮ দিন রাখিয়া ইনজেকশান আদি দিলে কিছুদিন বেশ সুস্থ করা যাইবে বলিলেন। বাঙলার কর্মক্ষেত্র পায়ের নীচ হইতে সরিয়া গিয়াছে, অন্নের করতলগত হইয়াছে, কিন্তু ভূমি পাইলে কি হইবে? পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করিতে হইলে 'অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং' এই শ্লোক স্মরণ করা আবশ্যক। প্রতিরোধ আন্দোলন যদি শক্ত হইয়া উঠে বাঙলায় বিহারীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য।

বঙ্গভঙ্গ যুগে সারা ভারতের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছিল। এবার নিজেদের সরকার, সে সুযোগও নাই। বুঝিয়া সুঝিয়া অগ্রসর হওয়া ভাল। সব দিক বিবেচনা করিয়া চলা ভাল। আমরা সবে মাত্র স্বাধীন হইয়াছি, এখন কি এইভাবে কেন্দ্রকে আঘাত করা সমীচীন হইবে? কিছুটা ভূমি পাইলেই কি তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে? ১১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার এই একাকিত্বের মধ্যে তোমাকে লইয়াই আমি আছি। এত বড় বিরাট তোমার দর্শন ও জীবন আজও কি অপরিচিত হইয়া থাকিবে? এক একবার মনে হয় ইহা বুঝি বা আমারই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা! আবার বর্তমান যুগের এদেশের ও দেশের মনীষীদের লেখা পড়িয়া মনে হয় এই দর্শন ছাড়া বর্তমান যুগ চলিতেই পারে না। শ্রীঅরবিন্দ তো এই দিক ধরিয়াই ভাবিয়াছেন। তবে কেন আমি একা? আমি সর্বস্তরে নর নারী, পিতা পুত্র, দেহ আত্মার সমান মূল্য স্বীকার করিয়া উহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা চাই কি না, তাই মানুষ ইহা ধারণা করিতে পারে না 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'-বন্ধনই আমার জীবনের সাধনা। কোনও অভিসন্ধি থাকিলে তো বন্ধনহীন গ্রন্থির আস্বাদন হয় না। এত বড় মুক্তির খবর মানুষ পরিপাক করিবে কি করিয়া? মানুষ কোনও কিছুদ্বারা বদ্ধ না হইয়া ভালবাসিতে পারে না, মুক্তের ভালবাসা মানুষ বোঝে না। অথচ আমি তো ইহাছাড়া আর কিছুই বুঝি না বা চাহি না। কাহারও সঙ্গে কোন অভিসন্ধিমূলক সম্বন্ধ আমার নাই। এতখানি স্বাধীনতা মানুষ চায় না। ঠাকুর, তোমাকে বুকে করিয়া চলিয়া যাইব। যদি স্বাধীনতার ভিতর দিয়া কেহ আসিয়া যুক্ত না হয়, আমার দলে দরকার না। একাই বেশ আছি। কোনও অভিসন্ধির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কাহাকেও অপমান করিতে পারিব না। তোমার জয় হউক। রেণু ১০ টায় হরিদাসবাবুর বাসা ও

ঘরের দোকানে যায় ও মহানিবাণ মঠ হইতে ফুল আনে। মঠে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু রেণুর সঙ্গে আলোচনা করিতে চান, কেন আমরা নিজেদের মত নিত্যগোপালের নামে চালাইতে চাই। রেণু বলে, 'আপনি আমা হইতে এত বড় যে আপনার সঙ্গে আলোচনা করিব না। আপনি পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করুন।' তিনি তাহাতে রাজী নন। এইভাবে আলোচনা শুরু হয়। Glory to God in the highest peace on earth' God will towards men. The highest, Earth ও man কে সমন্বয় করিয়াই নিত্যগোপালের ভক্তিযোগ সার্থক। অনেক দেরীতে—প্রায় কিছুটা আলোচনা হয়। রাত্রে বিষ্ণুপদ মুখার্জি আসে। আগামী রবিবার পাঠ না হওয়া ও পরদিন শনিবার পাঠ হইবে জানাইয়া দেয়। রবিবার বাগবাজার যাইবার কথা। ১১শে জানুয়ারী

কাল মঠের জ্যোতিরিন্দ্রবাবু রেণুর সঙ্গে আলাপ করিতে চাহে, আমি কেন আমার মত নিত্যগোপালের নামে চালাইতেছি। এর যে কোনো জবাব আমার নাই, দুইতাও রাখিনা যে একটা নূতন কথা আমি সৃষ্টি করিয়াছি। যে ধারা বহিয়া এতদিন ভারতবর্ষের শাস্ত্র ও সাধুগণ চলিয়াছেন, সেই tide এর এই বিরুদ্ধ আমার চিন্তাপ্রণালী যে ইহা আমার সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব। এই দর্শন নিত্যগোপালেরই; তাঁহার বিক্ষিপ্ত লেখা ইহাই সমর্থন করে। আমার ভিতর দিয়া ইহা আসিয়াছে এই মাত্র বলিতে পারি। বুদ্ধি করিয়া আমি কিছু করি নাই। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, শরৎ, তোমার যখন যাহা দরকার, ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাহাই বুঝাইয়া দিতেছেন, তাহা কি তুমি টের পাও না'? হাঁ, এই দর্শনখানাই তাহা টের পাইতেছি জ্যোতিরিন্দ্রবাবুদের চ্যালেঞ্জ আমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রমাণ করিয়া যাইতেই হইবে যে, এই 'মত' নিত্যগোপালেরই। ইহা না করিয়া আমি মরিতে চাই না। মরণে আমার কি সুখ। ঠাকুরই যদি প্রতিষ্ঠিত না হইলেন, কেন তিনি আমাকে ইহা দিলেন? দেওয়ার কি কোন অর্থ নাই? আমি কি এই দায় হইতে মুক্ত হইব না? তাঁহার স্নেহের দান এই দর্শন কি বিশ্বমানবের দরবারে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব না? ঠাকুর, তুমি তাহা কর। রেণু কোথাও বাহির হয় নাই। ভারতবর্ষে একা আমিই কি এই উজান পথে চলিয়াছি? আমার সম চিন্তাবিশিষ্ট কি কেহ নাই? কে এমন করিয়া সমস্ত শাস্ত্রকে, সমস্ত সাধনাকে এমন ভাবে নূতন করিয়া পাইয়াছে? ঠাকুরকে কোথায় রাখিয়া যাইব ইহা ভাবিলে মন হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমার মরণেও তো শান্তি নাই। যাহারা আমার সঙ্গে আছে, তাহাদেরও তো কোথাও স্থিত করিয়া দিতে পারিলাম না। এই পথে ইহারা একা কেমন করিয়া চলিবে! বাহিরে কেউ নাই। কয় জনের সঙ্গে আমাদের এই দর্শন আলোচনা করা চলে? এ পথের পথিক কি কেহ নাই এই বিশ্বে? কে আছ, এস, আমি প্রাণ খুলিয়া তোমাদের আহ্বান করিতেছি। আমার এই গুরুভার হাল্কা কর। বিশ্বের যে কত বড় প্রয়োজনীয় এই দর্শন! নিত্যগোপাল, মুখ তুলিয়া চাও। ১৩ শে জানুয়ারী

'ন বৈ বাচঃ ন চক্ষূংষি ন মনাংসি'—মন মন

নয়, প্রাণ মন। মন বুদ্ধি যখন প্রাণের শরণ লয়, প্রাণ হইয়া যায়, প্রাণকে নিজ সম্পদ সমর্পণ করে, তখনই প্রাণ-উপাসনা সিদ্ধ হয়। তখন মনে প্রাণ অবতরণ করে, মনের দ্বিধা বিভক্ত পরস্পরসন্ধী খণ্ডত্বয়ের মাঝে complementarity —পরস্পর পরিপূরকতা—নামিয়া আসে। Antagonism-ই মায়ার রাজ্যের ব্যাপার। সেই মায়ার মধ্যে যিনি 'যোগ' অর্থাৎ complementarity স্থাপন করেন, তিনি যোগমায়া'। এই যোগমায়ার উপাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ 'রথং' মনশ্চক্রে—স্বস্থরত অবস্থিত থাকিয়া রমণ করিতে মন করিলেন। যে মনে complementarity স্থাপিত হইল, সেই মনই প্রাণ। মনের একটি re-arrangement-এর নামই প্রাণ। বর্তমান সময়ে প্রাণ ও মনের মধ্যের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার আলোচনা প্রাণে প্রাণে মানুষ বোঝে, বুদ্ধি দিয়া বোঝে না। 'মন' ও 'প্রাণ'কে এক করাই যুগের সাধনা। তিনি 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা'। মন-বুদ্ধি এই ভাবে প্রাণময়ী অবাঙ্-প্রকৃতির একটি শাখামাত্র, সবখানি নয়। মন-বুদ্ধি যখন প্রাণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রাণময় হইবে, প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হইবে, তখনই পরপুরুষ সেখানে হাসিতে হাসিতে উদিত হইবেন। প্রজ্ঞার (মন-বুদ্ধির) প্রাণ হওয়ার মধ্যেই সর্বসিদ্ধি নিহিত, ইহাই গঙ্গা-সাগর সঙ্গম। নিতাগোপাল, আমার মনোময় প্রাণশরীর নেতা, আমার জীবনে তোমার জয় হউক। সকালে শচীবাবু আসে। রেণু স্কুল বোর্ড হইতে ৩০১ টাকার চেক আনে। রাইটার্স বিল্ডিং এ টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে। হরিদাসবাবু ইতিপূর্বে রিভিউ করা সম্পর্কে তাহার কাছে বলিয়াছেন। পরেশ ঘোষের ওখানে যায়। চৈতন শুদ্ধ ১৫৲ টাকার চেক দেয় বিজ্ঞাপনবাবদ। নিখিলবাবু প্রবন্ধ দেন। রেণু ফেরে ৩।। টায়। নীরোদবাবু আসে ৪ টায়। বাস্তুহারাদের বিষয়ের সভায় কে কে স্বাক্ষরকারী হইবেন, তাহা আলোচনা করে। ১৪ জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শনদ্বারা আমার জীবনকে ভাবিত ও রসিত করিয়া, তোমাময় হইয়া আমার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বকে গড়িয়া তুলিব এই সঙ্কল্প লইয়া একদিন পথে বাহির হইয়াছিলাম। আজও সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি কিন্তু গড়িতে পারিলাম কৈ? কে আমার সামগ্রিক আদর্শের সঙ্গে দেহে প্রাণে মনে যুক্ত হইবে? গড়িবার কাজে কেহ নাই। এ পথ যে অজানা পথ; এ পথ তো হনুমানের পথ নয়। এ পথে শ্রদ্ধা ও প্রাণ দুইকে লইয়াই চলিতে হয়। বুদ্ধিমান মন্ত্র যাজ্ঞবল্ক্যের কবল হইতে, বুদ্ধিমান ইংরেজের শাসন হইতে ভারতবর্ষ পুরুষোত্তমের বিধানে ছাড়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণ তো এখনও ঠিক ঠিক হাল ধরিতে পারে নাই। তাই সে দিশেহারা। এই transitional period এর মধ্য দিয়া আমি একা চলিয়াছি, তাই কেহ আমার নাই। যাহারা প্রাণে প্রাণে আমার কথা বোঝে, তাহারাও মন-বুদ্ধি দিয়া তাহা নিতে পারে না। ইহা সময়-সাপেক্ষ নিশ্চয়ই। অপেক্ষা আমাকে করিতেই হইবে। ঠাকুরও বার বার বলিয়াছেন, 'শরৎ, ধৈর্য ধর। ধৈর্য আর কত দিন ধরিব! আয়ু যে ফুরাইয়া আসিল। তোমার দর্শন ও জীবনের ছবি-পটন এই সংসারের বুকে হইয়াছে দেখিতে পারিলে নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিতে পারিতাম

আমার যে আজ মরণেও সুখ নাই ... ১২৪. টার পর প্রণবের সঙ্গে বাহির হয়। ফেরে ৪৪. টায়। প্রণব আসে ১১ টার পর তাহার উপর তাহার পিতামাতা শ্বশুর বাড়ীর লোকের মনোভাব চলিতেছে সংসারী হইয়া টাকা উপার্জন করিবার জন্য। অথচ সে তাহা পারিতেছে না। আমি তাহাকে লইয়া টানাটানির মধ্যে পড়িতে পারিব না। বিশেষতঃ শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব ও জীবন প্রচারের জন্যই আমি শুধু সন্ন্যাসী চাওয়া আমি। সংসার ও সন্ন্যাসের দুই দিকের কামেলা সহ্য করিবার মত বীর্য যাহার থাকিবে সেই আমার মতে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিবে। সুবিধাবাদ আমার দর্শনে নাই। সে আমার জীবনে জীবন মিলাইল না, দর্শন আমার কাছ হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইল না, সে কি করিয়া কি প্রচার করিবে? সেজন্যই তাহার এতটা ঝোঁক লক্ষ্য করি না। অন্ততঃ সন্ন্যাসেই এখন উচিত ছিল। তাহা তো দিয়াই দিয়াছি। গার্হস্থ্য বিবাহ আছে, গার্হস্থ্যতে সন্ন্যাসী কি চাওয়া যায় না। সে যদি আমাকে বরণ করে, আমি যদি স্বীকার করি, তাহাতে কি চলে না? বর্তমান আবেষ্টনে বাহ্যিক বেশভূষা গ্রহণ উপযোগী নয়। আমি তাহাকে লইয়া অতিষ্ঠ হইব। তাহার বাবা মা ও মহানির্বাণ মঠ আমাকে লইয়া পড়িবে। রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সুশীলবাবু আসেন সকালে কাল রিপাবলিক হলে বক্তৃতা দিবার জন্য। রমেন্দ্র আসে সন্ধ্যায় কলেজ স্কুলে ২৭ শে বক্তৃতা দিবার জন্য। সপ্তাহের মধ্যে কোনোদিন করিতে বলি, ঐ দিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যাইতে পারি। ২৫ শে জানুয়ারী

আমার নিশ্চিত অভিমত এই যে ভগবান পাইবার জন্য কাহারও সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীর পোষাকে পরিবেন তাঁহারাই যাহাদের হাত এমন ভাবেই গড়া যে তাহাদের বিবাহিত জীবন যাপন করিবার প্রবণতাই নাই এবং যাহারা বিশ্বের দরবারে পুরুষোত্তম প্রচারের জন্যই যেন প্রস্তুত, অপেক্ষা করিতেছে; যেমন নব যোগেন্দ্র, নারদ প্রভৃতি। যেখানে প্রচারের সুযোগ মিলিবে, সেখানেই তাঁহারা উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা volunteers of God—ভগবানের স্বেচ্ছাসেবক—গৈরিক হইল ব্যাজ। পুরুষোত্তমের চিহ্নিত সেবক। এইরূপ একদল একনিষ্ঠ সেবক না হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? আমার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যেও এই কথা লিখিয়াছি। যে সে সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিলে বর্তমান যুগের আবেষ্টনে সন্ন্যাস রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নাগরিক সভ্যতা, প্রাচুর্যের ও জটিলতার মধ্যে থাকাই যখন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, তখন প্রলোভন সামলানো সহজ হইবে না। পূর্বে সমাজের সাধারণ লোকের সরল জীবন-যাপনের সুযোগ ও আবেষ্টন ছিল এখন তাহা কই? জীবন এতো জটিল হইয়া পড়িয়াছে কি সংসারীর, কি সন্ন্যাসীর। কংগ্রেসের ভলানটিয়ার-দের যে দুর্গতি হইয়াছে যাহারা একদিন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, ততোধিক দুর্গতি হইবে এই সব সন্ন্যাস-ব্রতীদের যাহারা অন্তরে কামনা রাখিয়া ঘরের বাহির হইবেন। প্রণব সন্ন্যাস চায় আমার জীবনে যুক্ত না হইলে নৈষ্ঠিক সন্ন্যাস দেওয়া চলিবে না। যুগান্তরে রেণুর প্রবন্ধ 'ভারতীয় সংবিধানে নারীর স্বাতন্ত্র্য' বাহির হয় সবটাই। অনেকটা স্থান দিয়াছে। ৪ টার পর চেতলা পার্কে

১৬ শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বক্তৃতার জন্য যাই, সুশীল মিত্র যায়। রেণুগোপাও যায়। মূল সভাপতি প্রতাপ গুহ আসিয়া চলিয়া গেল, পরে প্রিয়রঞ্জন সেন বলিয়া চলিয়া গেল, পরের সভাপতি আমি। অতুল সেন, সুশীলবাবু, নরেন সেন, গোবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সারমর্ম :— 'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি' ইত্যাদি 'ভারতবর্ষের অঙ্গ আপ্যায়িত হউক, বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হউক। আমরা 'সর্বাণি সর্বম্' —all in all-কে গ্রহণ করি। আমরা যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি, ব্রহ্ম যেন আমাদের নিরাকরণ না করেন। অনিরাকরণ হউক, অনিরাকরণ আমাদের মন্ত্র হউক। আমরা সকলকে স্বীকার করিব, কাহাকেও নিরাকরণ করিব না। উপনিষদের এই মর্ম আমাদের হউক'। এতখানি তত্ত্ব লইয়া ভারতীয় সংবিধান এই ২৬শে জানুয়ারী আমাদের মধ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবিধানে ভারতের প্রতিটি জীবনের সঙ্গে মূলের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, hierarchy এখানে নাই। ইহার মধ্য হিন্দুরাজ নাই, ইসলামরাজ নাই, বনিক বা শ্রমিক-রাজ, পুরুষরাজ বা স্ত্রীরাজের স্থান ইহার মধ্যে নাই। ইহা স্বরাজ'। আমার ইষ্ট স্বরাজসুন্দর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। আজ পোষণের যুগ। ব্রিটিশের সঙ্গে সঙ্গে 'শোষণ' চলিয়া গিয়াছে। এই পোষণ বলকে, de-centralisation-কে বনিক শ্রমিকের মধ্যে, ব্রাহ্মণ আদিবাসীর মধ্যে, নর নারীর মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। মায়ের অন্তহুত যেমন সন্তানের জন্য, ধনীর ধন নির্ধনের জন্য, কুলীনের কুল অকুলীনের জন্য, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য মূর্খদের জন্য। চাই বিলাইয়া দিবার জন্য মায়ের হৃদয়ে টানানি। গুহকের রাজা, হনুমান-শবরী-অহল্যার রাজা হইয়াই রামকে রাজা হইতে হইয়াছিল। ইহাই রামরাজ্য। ভারতবর্ষ এতখানি সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ'। 'ভারতবর্ষ বিশ্বের পথপ্রদর্শক। বাঙ্গলা হইবে ভারতের পথ-প্রদর্শক। আজ বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত। তাহার defeatist mentality। সে বিহারীকে ভীতির চোখে দেখে। তাহার যে পরিপাক করিবার মত আগুন আছে তাহা সে বিস্মৃত। এই সম্ভাবনার বোধে জাগ্রত করাই হইবে বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের সাধনা। বন্দেমাতরম্, ১৬ শে জানুয়ারী

যতদিন দেহে রহে প্রাণ, ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া তোমার আদর্শে দেহ প্রাণ মন উজ্জীবিত করিয়া চলিব, 'ভয় করব না ভয় করব না'। আমি আগাইতে চাহিব সকল দিক দিয়া। থাকুক আবেষ্টন প্রতিকূল, হই আমি একা, নাই বা কেহ থাকুক আগে পাশে, তুমি তো আছ আমার 'সাত রাজার ধন এক মানিক'। তুমিই আমার যশ, তুমিই আমার সর্বস্ব। তুমিই আমার 'আত্মা', তোমার মধ্যে রমণ করিয়াই আমি আত্মারাম হইব, 'আমনি এব আত্মনা তুষ্ট' হইব। তাহার পর তোমা-রাম হইতে হইতে যদি বিশ্ব-রাম হইতে পারি ভাল। নচেৎ তোমাতে আমি, আমাতে তুমি হইয়াই বাকি দিন কয়টী কাটাইয়া দিব। তোমাকে লইয়া যতখানি বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া পড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা হয়তো বা হইবে না। সব সাধই তো সব সময়ে মেটে না। আবার আসিব তোমার সঙ্গে তোমারই

বিশ্বে তোমারে জীবন দিয়া বিশ্বকে জাগ্রত ও ধ্বনিত করিবার প্রেরণা বুকে লইয়া। তুমি যখন যখন আসিবে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিব। তুমি আমি, আমি তুমি এই ভাবে অনন্ত কাল চলিব। ভয় নিতান্তোপাল। বেলা ৯ টার পর শ্মশানে গিয়া অশ্বিনীবাবুর স্মৃতিস্তম্ভের নিকট প্রার্থনা করি ও মালা দেই। 'যে সমর্থ জীবন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ছিল, তাহাই তোমার শুদ্ধ বিজয়-কৃষ্ণের ভিতর দিয়া পাইয়াছিলে। তোমার জীবন সর্বক্ষেত্রকে স্পর্শ করিয়াছিল, সকল ক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। তোমার সত্য প্রেম পবিত্রতা আবার প্রচারিত হইবার প্রয়োজন আজ খুব বেশী। তোমার তারুণ্য আমাদের হউক। সেই তারুণ্যে আমরা দেশকে গড়িয়া তুলিব। তোমার পদ্মিপাত'। রেণু ১টার পর বাহির হয়। প্রিমিয়ার থিয়েটার শুরু, জেনারেল প্রিন্টার্স হইয়া ফেরে ৭টায়। বীরেন আসে, সকলকে ইনভেকশান দেয়। পি সাহার ব্যবস্থানত নিতান্তত অজ অর্পিত অয়েল মাখিয়া ইডেন গার্ডেনের কাছের গঙ্গায় স্নান করিয়া আসে। অশ্বিনীবাবুর স্মৃতি সভায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে যাই নাই। নয় ট্রামে দাঁড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইহারা যানের বন্দোবস্ত করিলে হয়ত যাইতাম। ১৭ শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার কৃপায় দুর্গম পথে চলিবার সাহস বীর্য ও কৌশল আমি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলাম। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয় বদন্তি'। ১৯১৯ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী 'অজানা'-র কাছে ঝাঁপ দিয়াছিলাম। ঝাঁপ দেওয়ার পর অজানা জানা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ বিহার একীকরণ বা সমন্বয়ের পথও 'অজানা' বলিয়াই কেমন 'ভয় ভয়' করিতেছে, কিন্তু ইহাই তো ব্যাপকতম, গভীরতম জীবনের পথ। এই পথে বাঙলা বাঙলা থাকিয়া বাঙলার ঊর্দ্ধে উঠিবে, বাঙলার কৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর হইবে, বিহারও বিহার থাকিয়া বিহারের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিবে। বঙ্গ বিহার সম্পর্ক মধুর হইবে। উদ্বাস্তু সমস্যা লইয়া হিমসিম খাইতে হইবে না। বাঙলার কৃষ্টি নষ্ট হইবে বলিয়া যাহাদের পরাজিতের মনোবৃত্তি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার মনোবৃত্তি পাকিস্থানেরই মত বাঙলাকে পাইয়া বসিয়াছে। ব্যাপকতর ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়া জয় করিতে পারিলেই তাহা বাঙলার 'অতীত সাধনা'র সঙ্গে খাপ খায়। বিহারের ভয়ে আজ বাঙলা অস্থির। কি দুর্ভাগা বাঙলার! ঠাকুর তুমি ইহাদিগকে বাঁচাও। শচীবাবু ফ্লক দিয়া যায়। রেণু দেখে। একবার রাজেন মিত্রের ওখানে গিয়ে স্টাগার্ডে ফোন করে। গগেন ঘোষকে পায় না। ৪ টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। 'মহীয়সী ভক্তি প্রভাবে শ্রীভগবানকে সর্ব ভাবে সম্ভোগ করা যায়'- এই অধ্যায়টী ৩ বার পাঠ করা হয় ও ঈশোপনিষদ হইতে intuition সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণনের লেখা পড়া ও ব্যাখ্যা করা হয়। Intuition is highest form of intelligence' —ইহার মধ্য separated and(?)tendency-র স্থান নাই। একটা বিরাট ঐক্য ইহার মধ্যে পাইয়াছে। রাজেন ও বিষ্ণুপদ আসে, বেরোনো স্থানে। নীরোদ বরণ যে আসিল না। কাল কেমন

করিয়া কখন যাইব, কিছুই জানিলাম না। এই তো মানুষের অবস্থা। ১৮শে জানুয়ারী

মানুষের মন-বুদ্ধির মধ্যে separatist and discursive tendency এত বেশী বলিয়াই নিজ জীবনে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বে ও ধর্মে এত সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে মানুষের সাধনা ব্যক্তিগত হইয়াছে। ভক্তি হইতে জ্ঞান separate—পৃথক, ভক্তি জ্ঞান হইতে কর্ম পৃথক। ভক্তদের মধ্যে আবার পৃথক উপসম্প্রদায় আছে। ধর্ম রাজনীতি 'পৃথক', জীবনের বৃত্তিসমূহ পৃথক। জীবন-প্রদীপ তাই আজ নির্বাপিত-প্রায় এই একান্ত পার্থক্যের সংঘাতে। জীবন তাই 'অন্ধ'। জীবন, আত্মা বলা পণ্ডিত যদি দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন সব intuition-এর (অনুভবের) মধ্য দিয়া একীভূত হইত। তখন দেহও আত্মা হইত, মনও আত্মা হইত, প্রাণও আত্মা হইত। ব্রজে রাসমণ্ডলে জীবনের এই separatist and discursive tendencyগুলির অন্যোন্যাবদ্ধত্বাত্মক, পরস্পর পরিপূরকত্ব, এক-বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার এক মহান আদর্শে আস্বাদিত হইয়াছে। বিশ্ব আজ তাহারই অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছে। বহু বিহারের separatist tendency-র অবসান ঘটাইবার জন্য এই আন্দোলন আসিয়াছে। 'এক হউক এক হউক হে ভগবান' নীরোদবাবুর খোঁজ নাই। ১ টার পূর্বে আমি উষা প্রতিভা রেণু গোপা ও সেবানন্দ রওয়ানা হইয়া প্রথম বাসে শ্যামবাজার পরে ট্যাক্সীতে বাগুইআটি যাই। নীরোদবাবু শেরিফ সুরেন সেন ও জিতেশ ওহদের আনিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিলাম ২. টায় সভা আরম্ভ হয়। পৌরোহিত্য করি আমি, প্রধান অতিথি সুরেন সেন। জগদীশবাবু কৃপতিবাবু, প্রকাশ দাস বলেন জিতেশ গুহ বাণীগুলি পাঠ করে অশ্বিনীবাবু যে থিয়েটার নাটকের বিরুদ্ধে তাহারও উল্লেখ করে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই জীবনে সিনেমা দেখি নাই। ১ দিন মাত্র বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে থিয়েটার দেখিয়াছিলাম। অশ্বিনী-কুমার টাউন হল সিনেমা কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ৪৫ দিন উপবাস করিয়া উহা তুলিয়া দিয়াছিলাম। তবে বর্তমান আবেষ্টনে অশ্বিনীবাবুর সত্য প্রেম পবিত্রতার আরও ব্যাপকতম রূপ প্রয়োজন। Evolution—বিবর্তন—এর পথে তাহা আসিয়াছেও। নাগরিক সভ্যতাকে আরণ্যক সভ্যতার ভিতর পরিপাক করিতে হইবে। এমন ভাবে সত্য প্রেম পবিত্রতার re-orientation করিতে হইবে যাহাতে নাগরিক সভ্যতার মর্যাদা রাখিয়া পরিপাক করা যায়।

বিষ্ণুপদ ও রাজেন বাগুইআটি গিয়াছিল। ভূপতিবাবুর সঙ্গে রেণুর ঘর উঠানো সম্বন্ধে কথা হয়। এক মাসের মধ্যে ঘর তুলিয়া দিবেন বলিলেন। ১৯শে জানুয়ারী

অশ্বিনীবাবুর যুগে যে আবেষ্টনে সত্য প্রেম পবিত্রতার যে রূপ তিনি আস্বাদন করিয়াছেন, বর্তমান যুগের বর্তমান জটিলকুটিল আবেষ্টনে সত্য প্রেম পবিত্রতার সে রূপ তো চলিবে না। বর্তমান যুগে সত্য প্রেম পবিত্রতার আরও ব্যাপকতর গভীরতর রূপের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। কাম দমনের যে সব কৌশল ভক্তি-যোগে শিখানো হইয়াছে, কৃষ্ণের মনঃ

সংকীর্ণের পর তাহার আর কোনও মূল্য নাই। নিগ্রহ তো চলিবে না, মরণ-চিন্তায় কি কাম মোহিত হয়? চাপা পড়িতে পারে কিছু সময় এই পর্যন্ত। নারী-স্বাতন্ত্র্য যেখানে সংবিধান-সম্মত, co-education যেখানে সর্বজনস্বীকৃত, সেখানে ব্রহ্মচর্যের কি রূপ হইবে? যেখানে "pragmatism 'truth for-us'-নীতি শিখাইয়াছে, সেখানে সত্যের কোন্ রূপ চলিবে। আজ নূতন করিয়া সত্য প্রেম পবিত্রতার অর্থ (re-orientation) প্রয়োজন হইবে। শ্রীনিতাগোপাল ছাড়া কে re-orientation দিবার দুঃসাহস রাখে? ভারতীয় প্রচলিত চিন্তাধারা বিরুদ্ধ, উজান। আমি against the tide চলিয়াছি বলিয়া, সত্য প্রেম পবিত্রতার বর্তমান যুগোপযোগী ঠিক ঠিক অর্থ মানিয়া চলি বলিয়া কোন লোক আসিল না। তবে ভাবি, এই চিন্তাধারা আছে এমন ১০৮ লোক কি সমাজে নাই? ঠাকুর, যাহা হয় করিও। আমি একা ঠেলাঠেলি করিয়া সেলাম তোমার জয় হউক। রেণু ১০ টার পূর্বে বাহির হইয়া ফেরে ৪।৫ টায়। প্রিমিয়ার, পগেন ঘোষ প্রভৃতির ওখানে যায়। কোনও দিক দিয়াই তেমন করিয়া আগাইতে পারিতেছি না। তোমার স্পর্শ পাওয়ার পর হইতে আমি তো বাপ হই নাই। যাহারা চ্যালেঞ্জ দিয়াছে, তাহাদের কাছে কি জীবন দিয়া জবাব দিতে পারিব না?....

৩০ শে জানুয়ারী

সামগ্রিকতার মধ্যেই ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান সহজ।.... সামগ্রিকতারও ব্যাপকতা সম্ভব। বঙ্গ বিহারকে সমগ্র ভাবে নিলে প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানই সহজ হইবে যেহেতু বঙ্গ হরিজনের একীকরণ করা যাইতেছে, অতএব ভারতের সমস্ত প্রদেশের সমীকরণ হইলে ক্ষতি কি—যুগান্তর' পত্রিকার এই যুক্তি false logic। বঙ্গ বিহার পরস্পরের সঙ্গে বহু বিষয়ে জড়িত। তাই উহাদের সমীকরণের প্রশ্ন উঠিয়াছে। বোম্বাই বাঙ্গলার সীমানাগত সমীকরণের প্রশ্ন অবান্তর। আদর্শগত, ভাবগত সমীকরণ তো চাই-ই। ভারত-বিশ্বের সমীকরণও তো লক্ষ্য থাকা উচিত। যাহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে তাহাদের মধ্যেই সমীকরণের প্রশ্ন মুখ্যত উঠে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাত চলিতেছে বলিয়াই আজ সমন্বয়ের কথা উঠিয়াছে। কেননা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, পরিপাকও করিতে পারিতেছে না। তাই ব্যাপক ও গভীর ক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয় সম্ভবপর হইবে। আর জীবনের কাছে সংখ্যার প্রশ্ন গৌণ সংখ্যাকে ডিঙাইয়া জীবনের গতি প্রবাহিত হয়। সংখ্যা তো মায়া। সমগ্র জীবনের মুক্তি শ্রীনিতাগোপাল অন্বয়ুক্ত হউন। রেণু ৭ টার মধ্যে বাগুইআটি যায়। ঘর শেষ করিতে প্রায় ৩০০৲ টাকা ও এ্যাসবেসটাস শীট লাগাইতে ১৫০৲ টাকা মত লাগিবে। এক ভদ্রলোকের কাছ হইতে ৫০৲ টাকা পাওয়া যায়। ঐ টাকা দিয়া আসে। ভূপতিবাবুর ওখানে খায়। মেথর দিয়া সমস্ত জমিটা পরিষ্কার করানো হইবে। সুবোধ মহুকে লইয়া প্রায় ১০ টায় আসে। সুবোধ ১।৷ টায় চলিয়া যায়, মহু প্রতিষ্ঠা কেরা পর্যন্ত—রবিবার পর্যন্ত থাকিবে। মহুর বই কিনিয়া দেওয়া হয়,

ওরভিরও একটা কেনা হয়। সকমিতা আজ কেনা হয়। মীরার যাইবার খরচ বাবদ ৬০৲ টাকা মার দিতে হইবে। ৩ শে জানুয়ারী

রাজশেখর বসু মহাশয় বঙ্গ বিহার সম্মীকরণ সম্পর্কে বলিয়াছেন এই প্রস্তাব একেবারে ফেলিয়া দিবার মত নয়, postpone করিয়া রাখা উচিত। ইতিমধ্যে বিহার বাঙালীর উপর যে অত্যাচার করিতেছে এবং বাঙলা সম্বন্ধে কিছু অত্যাচার করিয়া থাকে তাহা বন্ধ করা উচিত। আমরা বলি একত্রীকরণ হইলেই এইরূপ অত্যাচার হইবার পথ রুদ্ধ হইবে আর একটু রেষারেষি থাকিলই বা? পূর্ববঙ্গ-পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে, পশ্চিম বাঙালের রেষারেষি কি কম? এই রেষারেষি সত্ত্বেও যেমন ইহারা এক, তদ্রূপ এক্যই হইবে। Bilingual বা trilingual কানাডা সুইজারল্যাণ্ডও তো আছে। রাজ্য-পরিচালনার খরচ অনেক কমিয়া যাইবে। বঙ্গ এই নাম থাকিবে কিনা? না থাকিবার কারণ কি? আর কত নাম যে মুছিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক আছে? কোথায় আর্যাবর্ত, কোথায় কলিঙ্গ, কোথায় মালদা? পূর্ববঙ্গ নামও তো লোপে-ভোবে। আর সংখ্যার গরিষ্ঠতা লঘিষ্ঠতা? সংখ্যা কি জীবনের চেয়ে বড়? সংখ্যার মোহ ঘুচাইয়া জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিপাক করাই হইল না। সংখ্যা তো মায়া। ঠেলা পরিলে অল্প সংখ্যা বেশী হয়। জীবন-সাধকের এই সব বাধা অতিক্রম করিতেই হইবে। জীবন-বল্লভ নিতাগোপাল, তোমার জয় হউক। সকালে যমুনা আসে, প্রতিভা যমুনা ৩ টার পর নারায়ণপুর রওনা হইয়া যায়। রেণু একবার বাহির হইয়া ৩ টার পূর্বে ফেরে। ....১০ টায় সুবোধ মুখার্জী আসেন। রাত্রিতে মাথা বেশ ধোরে; বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। বেলা ফেব্রুয়ারী

উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র গীতার ভাষ্য, পত্রিকার প্রবন্ধ ও ১৮ খানা বই রহিল যাহারা আমার সন্ধানের কাজ করিবে আমার শ্রাদ্ধ করিবে, আমার কথা কহিবে, মানুষের কাছে আমাকে উপস্থিত করিবে, শ্রীনিতাগোপালের মহিমা ও মাধুর্য প্রচার করিবে। কে বা কাহারা ইহাদিগকে লালন পালন করিয়া পুষ্ট করিবে জানি না। রাখিয়া গেলাম এই পর্যন্ত। আমার মত বিপ্লব-পন্থীর সঙ্গে কে থাকিবে? কোনও prejudice আমি রাখিতে চাই না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে পরকীয় সাধনার প্রবর্তন করিয়াছি। সকলকে আমি ছাড়িয়া দিয়াই রাখিতে চাহিয়াছি। কাহারও কাজে কিছুর জন্য বাধা পড়িব না, কাহাকেও বাঁধিব না কোনও অভিসন্ধি আমার নাই। আমি সত্য প্রেম পবিত্রতার উপাসক। চুনীলাল মিত্র শিষ্য হইবার জন্য ঘুরিয়াছিল, প্রণব সন্ন্যাস লইবার জন্য ঘুরিয়াছে, তাহা হয় নাই। আমার কি দল গড়িবার বুদ্ধি আছে? মানুষকে exploit করিব না, মানুষ-দ্বারা exploited হইব না—এই ধারার পথ-চলার ধারা, তাহার কি ফল হয়? শ্রীনিতা-গোপাল জয়যুক্ত হউন। রেণু ১১. টার পর বাহির হইয়া ট্রাম টিকেট কিনিয়া, ফেরত হইয়া ৪।৷ টায় ফেরে। সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র দত্ত মজুমদার

তাহার স্ত্রী ও আমেরিকার এক সাহেবকে লইয়া আসেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, ধ্যান কি করিয়া সম্ভব? তাহার ভাষা ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। গুরু সাক্ষাৎকার না হইলে ধ্যানের ভিত্তিই প্রস্তুত হয় না। ধ্যানের বস্তু শুদ্ধ ভিতরে কোনও রকমে কিছুটা প্রত্যক্ষ হইলেই তবে বাস্তব ধ্যান সম্ভব। নিজের মন গড়া ছবি আঁকিয়া তাহাকে ধ্যান করিলে বাস্তবের স্পর্শ কি করিয়া মিলিবে? ধ্যানের পথ ও উদ্দেশ্য যদি এক না হয়, ধ্যান জমে না। ধ্যানের আরম্ভ হইবে God centred। ধ্যান egoistic হইলে ধ্যানের বস্তু recede করিবেই শেষকালে যাহা কিছুকে ধ্যানের বস্তু বলিয়া 'পাওয়া হইল' মনে হইবে, তাহাও হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা অপাবৃত সত্য ছাড়া কিছুই নয় সাধনার evolution এ এই পথ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে ইহা ফেব্রুয়ারী

'যিনি ভালোবাসা নন, যাঁহার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ, সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, যাহার সম্বন্ধে ধারণা শুধু আঙ্গিকমাত্র, তাঁহার সাধন ভজন ধ্যান ধারণা কি করিয়া সম্ভব? তাহা কি বিকল্পের মতো পড়ে না? যাহাকে ধ্যান করিব তাহার সম্বন্ধে কচি তৃষ্ণা ভালবাসা থাকিলেই না তবে তাহার ধ্যান করিব? তখন ধ্যান হয় সহজ স্বাভাবিক। কাহার ধ্যান করিতেছি? কে সে আমার? কিসের জন্য ধ্যান করিব? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে তাঁহার সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ' কোনও সম্বন্ধ পূর্বে স্থাপিত হওয়া চাই। এই জন্যই চাই এমন কোন লোকের স্পর্শ যাহার জীবনে আমার ধ্যানের বস্তু বাস্তব হইয়া আছে, যিনি আমার ধ্যানের বস্তুময়, যাহাকে ধ্যান করিলে আমার ইষ্টকেই ধ্যান করা হইয়া যায়। যিনি ধ্যান করেন এবং যাহার ধ্যান করা হয়, ইহার মধ্যে ধ্যানের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা কাহার বেশী! পিতা পুত্রের ধ্যান করেন—ইহাই স্বাভাবিক, কয়জন পুত্র পিতার ধ্যানের জন্য বসিয়া থাকে? পুত্রের জন্য পিতার ধ্যানকে যদি পুত্র ধ্যান করিতে পারে, তবেই পুত্রের সিদ্ধি আসে। পিতাই যে পুত্রের ধ্যানে বিভোর ইহা সাধু-শাস্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন, ইহা না মানিয়া উপায় নাই ইহা হইতেই গৌণ সাধনা সুরু হয়, পরে 'গুরু' সাক্ষাৎকার হইলে মুখ্য সাধনা সুরু হইবে। উদ্বোধনভারতের কিছুটা রেণু একটায় পূর্বে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। বাকিটা কাল দিবে।

৪টি প্রাণী দিন কাটাইতেছি। কোনও সাড়াশব্দ মানুষের কাছ হইতে নাই। ২দিন হইতে মাথা ঘুরিতেছে, specific ১, ৪ বার পাই, sp.। কিছুদিন হইতে খাইতেছি। চোখের ঔষধ sp 5, 6 খাইব। 'অগ্নি' হইতে সুভাষবাবু লেখা কিছুটা পড়ি। তিনিও 'সমন্বয়' বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, দার্শনিকভাবে সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি সমাজে তাহা স্থাপন করা সহজ হইবে? এ দেশের দর্শন ও স্মৃতি তো সমাজ-তান্ত্রিক নয়। সমাজ তান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতি পদে এই দর্শনের সঙ্ঘর্ষ লাগিয়াই আছে। এই দর্শন যে অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক, reactionary। পুরুষোত্তম-দর্শনে ইহা রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সমাজ-চক্র আগাইতে পারিবে না। ২রা ফেব্রুয়ারী

প্রকৃতি পুরুষ সমন্বিত হইলেই দিব্য কর্ম সম্ভবিত হয়। যেখানে প্রকৃতি পুরুষের সম্পর্ক শুধুই ব্যবহারিক (পারমার্থিক নয়), সেখানের কর্ম 'আসুর' বিনাশশীল। এত দিন এই বিনাশশীল কর্মের কথাই এ দেশের অদ্বৈতবাদিগণ শুনাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিতাগোপাল দ্বৈত অদ্বৈতবাদের সমন্বয়ে যে 'প্রকৃত অদ্বৈতবাদে'-র কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে মায়া-ব্রহ্ম সমন্বিত বলিয়া সেখানের কর্মও দিব্য। সাগরের নিস্তরঙ্গ অবস্থা যখন তরঙ্গায়িত অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত, যখন তরঙ্গায়িত অবস্থা নিস্তরঙ্গ অবস্থার যোগে সুশৃঙ্খলিত, সুবিন্যস্ত এবং নিস্তরঙ্গ অবস্থা যখন অতিমাত্রায় তরঙ্গায়িত অবস্থাকে সংযত না করে, অর্থাৎ সীমা করে তখনই পুরুষোত্তম-মাত্রার মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয় দিব্য কর্ম। নিস্তরঙ্গ অবস্থাই পুরুষ, তরঙ্গায়িত অবস্থাই প্রকৃতির প্রভাব। সে জীবনে এই দুই অবস্থা সুসমঞ্জস, সেই জীবন সুস্থ জীবন, পুরুষোত্তম-জীবন। এই জীবনই তো চাই। বর্তমান যুগ ইহারই উপাসক। এই কথা লইয়াই শ্রীনিতাগোপাল অবতীর্ণ। আমি তাহাই ধারণ করিব, বহন করিয়া দুয়ারে দুয়ারে লইয়া যাইব, ইহাই আমার ব্রত। সন্ধ্যায় ললিত সরকার আসেন। পরে আসেন তালার সন্তোষ চাটার্জী। তাহার সঙ্গে তালায় গেলাম, যখন বোধহয় ১৯৩১ কি ৩২এ সেখানে বক্তৃতা দিবার জন্য তারাপদ ঘোষের সঙ্গে গিয়াছিলাম। এতদিন আমার কথা তাহার মনে আছে। অমৃতবাজার পত্রিকায় নরনারায়ণ আশ্রমে পাঠের বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া আসিয়াছে। আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কাল আসিবে বলিল। যখন যেখানে গিয়াছি মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়াই মিশিয়াছি। কোনও অভিসন্ধি ছিল না। তাই মানুষ আজিও প্রাণে প্রাণে ভালবাসে। তবে আমার বিপ্লবী চিন্তাধারা ও জীবন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না বলিয়া কাছে ঘেঁসে না। সন্ধ্যার পূর্বে সুবোধ এসে। ৬৲ টাকা দেই। মন্তু যাইতে চাহিল। সুবোধের সঙ্গে সে চলিয়া যায়। মীরার সঙ্গে দেখা তাহার চক্ষু চাই ই মীরা যদি চলিয়া যায়। বাকী উজ্জ্বলতার রেণু ওটার পর পোষ্টাফিসে দিয়া আসে। ৭ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, সে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া আমি চলিতেছি, তাহাকে পরিপাক করিতে হইলে চাই শক্ত একটি স্থিতিভূমি। সেই স্থিতিভূমি তুমি। তোমাতে আমি স্থিত হইব, এমন ভাবে স্থিত হইব যাহাতে সমস্ত ঝড় ইহাকে আঘাত করিতে আসিয়া ইহার মধ্য পরিপাকে প্রাপ্ত হয়, যেমন প্রাণকে আঘাত করিতে আসিয়া অন্ধেরা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল প্রাণ স্থিতি আমার হৃদয়। তোমার প্রেমে চুম্বিত প্রাণস্পর্শ আমাকে বলীয়ান করুক। এই ঝড়ের মধ্যে অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া সব কিছুকে যেন সহিতে পারি। আজ এখানে আমি রেণু ও গোপা আছি। মন্তু কাল সন্ধ্যায় চলিয়া গিয়াছে। এমন একা কেহ থাকে? আজ ভোরে পার্বতী-বাবুর বাসায় রেণু চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট কাজের তো অন্ত নাই। যখন যেভাবে প্রভু রাখিবে আমারে''' যেন না ভুলি তোমারে। তুমি আমার স্থিতিভূমি। যাহার জীবনে ঝড় যত বেশী, তাহার তত দৃঢ় স্থিতিভূমি, ব্রাহ্মী-স্থিতি দরকার।

তুমিই আমার নোঙর। বেণুর পার্বতীবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। তাঁহার ভাগিনের বৌর কাছ হইতে নরনারায়ণ আশ্রমের ৫৲ + উজ্জলভারতের ৫৲ + জীবনে ও দর্শনে ১।৷ — ১০৷ টাকা আনে। ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। প্রাণেন অনুষ্ঠ, বিষ্ণুপদ কমলা নিয়া আসে। ললিতবাবু প্রারম্ভ সঙ্গীত গান 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর'। সন্তোষ চ্যাটার্জী ½ ঘণ্টা পরে আসে। অনন্ত দত্ত, গজেন্দ্র কর, হরিদাস বসাক, বিলাস পাল, সতীন্দ্র দাস গুপ্ত প্রভৃতি আসে। 'মহীয়সী ভক্তভক্তি প্রভাবে' অধ্যায়টী পুনরায় পাঠ হইবার পর উহার সারাংশ বলা হয়। পরে পরের অধ্যায়টী আরম্ভ হয়। মহীয়সী ভক্তি প্রভাবে সর্ব ইষ্ট সমন্বয়, সর্ব সম্প্রদায় সমন্বয় হয়। Divine psychology অবতরণ না করিলে এই সমন্বয় সাধিত হয় না। মানুষের মনস্তত্ত্বে সাম্প্রদায়িকতা অনিবার্য। পুরুষসূক্তের পুরুষ যেমন 'সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ', আমাকে ভগবত্তাদ্বারা তাহাই উপার্জন করিতে হইবে। অনন্ত দত্তের বাড়ী গিয়াছি, তাহাদের অন্ন খাইয়াছি, কবিরাজ শ্রীশ দত্তের বাড়ী গিয়াছি—এমনি কত লোকের অন্ন স্নেহ ভোগ করিয়াছি। আমি তো তাহাদের লইয়াই আমি, আমিও যে বিশ্বরূপ—এই ভাবনায় দেহ ভাগবত রূপ ধারণ করে, রূপান্তরিত হয়। রাত ৮৷৷ টার পর প্রতিভা গুরুসহ আসে। গোবিন্দ কিছু মরদা, আলতা, মিষ্টি প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছে। রধুর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। অমিতাভ সুজাতা ১২টার পূর্বে আসে। ৫ই ফেব্রুয়ারী

পুরুষোত্তম-লীলাকর্মের যে অংশ আমার জীবনের মধ্য দিয়া স্ফুরিত হইবার জন্য আমার জীবনে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাই আমার 'কর্ম': ইহাই কর্ম-রহস্য। 'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গ কর্মসংজ্ঞিত'। যে পুরুষোত্তম-কর্ম fact (ভূত, স্বতঃসিদ্ধ, অতীত) রূপে আছে, তাহাকে task (ভাব, বর্তমান) রূপে উদ্ভব করায় যে বিসর্গ (কর্মার্পণ), তাহাই কর্ম। কর্মার্পণই আমার সত্যিকার কর্ম। কেননা কর্মার্পণের মধ্য দিয়াই পুরুষোত্তম-কর্ম আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। আমার জীবনে ভগবানের যাহা message, mission, তাহাই আমার কর্ম। এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কোন্ part আমাকে play করিতে হবে, তাহাই চেনাই নিজেকে চেনা। 'বিশ্বমঞ্চল' অভিনয়ে যদি আমাকে 'অবের part play করিতে হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? সমগ্র অভিনয়কে যিনি যে ভাবে পারিবেন পুষ্ট করিলেই তাহার সার্থকতা মিলিবে। ইহার মধ্যে কার part ভাল, কার part মন্দ ইহা বিচার করিবার অধিকার আছে? প্রত্যেকের কর্মই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' এ বিশ্বে কাহারও মত কেহ নয়। ঈর্ষার অবসর আছে কি এ বিশ্বে? প্রত্যেক জীবই spark of পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম-কর্মকে অতিক্রম করিয়া কেহ কিছু করিতে পারে না। তাহাকে আমার প্রাকৃতিক আবেষ্টনে develop করিয়া তোলার নামই কর্ম। 'পূর্বরূপম্ অনুজ্ঝন্' —পুরুষোত্তম-কর্ম (পূর্বরূপ) পরিত্যাগ না করিয়া আমার কর্মকে উদ্ভাসক করিয়া তোলাই কর্মের রহস্য। বেণু ২টার পর যাত্রা হইয়া গেলেন ঘোষ ও সুশীল পাকুলীর ওখানে যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। বৈকালে কিতীন্দ্র রায় চৌধুরী (নাগপুর) আসেন। আমাদের কথা হয়। উজ্জলভারতের আমাদের

কথা ও তাহারই আরবীয় নাগরিক সভ্যতা প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেই। তাহাকে আমার সঙ্গে চলে যাইতে দেওয়া হয়। রেণু আসিলে পর চলিয়া যায়। হরিপদের সঙ্গে যজ্ঞেনবাবুর ওখানে রেণুর দেখা। সকলেই আসে, যায়। কাহারও কি ধ্যান বা আদর্শ-নিষ্ঠা নাই? গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিবার জন্যই কি মানুষ? ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি দেখিতেছ তোমার মঠ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে!! এ দিকে কি কাহারও দৃষ্টি পড়িবে না? শ্যামল দত্তও মঠে পাঠ করে! সে কর্পোরেশনের একজন যুবক কাউন্সিলার। তোমার কথা মঠে আলোচনা হয় না বলিলেই চলে। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু রিডিং পড়েন তোমার লেখা। অথচ তোমার লেখারই তো চলা উচিত ছিল? ৬ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমার উপর যেন আমার অচল অটল বিশ্বাস থাকে, তোমার উপর যেন আমার সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে। কে আছে আমার যাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তুমি ছাড়া আমার আগে পাশে সামনে পিছনে, উপরে নীচে কে আছে যাহার উপর ভরসা করিতে পারি? তুমিই আমার আশা ভরসার স্থল। তোমাকে বুকে লইয়া আমি যেন একা চলিতে পারি। দলে আমার কি দরকার? দল তোমার ইচ্ছা হয় জীবন্ত মানুষ লইয়া করিব। নয় একা আছি বেশ আছি। শোষণ তো কাহাকেও করিতে পারিব না। কাহারও দ্বারা শোষিত হইতেও পারিব না। প্রবন্ধে গৌরব দেই নাই বলিয়া সে আসা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই কি আমাকে আদর্শ করার নমুনা! আজও ঘটক কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল! মানুষ কি পাথর, মেলামেশায় কোন মূল্যই দেয় না? আমি যাহাকে যাহা একদিন বলিয়াছি, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য, রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, করিব। প্রতি সম্পর্কের আমি মূল্য দিতে শিখিয়াছি। আমার সম্পর্ক তো শুধু ব্যবহারিক নয়। উহার যে ভাগবত রূপ আমি আস্বাদন করিতে চাই। তোমার জয় হউক। রেণু ৭টার পূর্বে বাসেই আসে যায় ১০০৲ টাকা কৃপতি বাবুকে ঘরের জন্য দিয়া আসিতে। কৃপতিবাবুর বাসায় খায়, জিতেনবাবুর বাসায় বসিয়া কথা হয়। ঘরটায় বারান্দা দিবার কথাও হয়। এ্যাসবেসটাস দেওয়াই ঠিক হইল। করোগেটেড টিন পরে যজ্ঞেনবাবুদের নিকট হইতে নেওয়া হইবে অন্য ঘর তুলিবার সময়ে। ফেরে ১টার একটু আগে। ফাল্গুনের জন্য 'কর্মরহস্য' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে উষাক্লিনীর চক্ষু দেখান হয়।...৭ই ফেব্রুয়ারী

বৃন্দাবন হইতে গৌরাঙ্গদাস বাবাজী আমাকে রাধাতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব প্রচারের জন্য গুজরাট নিয়া যান। সঙ্গে কুমার ছিল। প্রথমে সুরাটে যাই। সেখানে ৩দিন বক্তৃতা হয়। সেখানে নর্মদা প্রসাদজীর সঙ্গে দেখা। তিনি গৌরাঙ্গদাসের বন্ধু। তিনি কিছুদিন নবদ্বীপ থাকিয়া বাঙ্গলা শিখিয়া গুজরাটীতে মহাপ্রভুর একখানা জীবন চরিত লেখেন। আমার ৩দিন বক্তৃতার ঘোষণা শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন হিন্দীতে আমি কিরূপ বক্তৃতা দিতে পারিব তাহা মনে করিয়া। আমারও ভয় ছিল—প্রথম প্রথম হিন্দীতে বক্তৃতা কিনা। অবশ্য ইহার পূর্বে এলাহাবাদ কুম্ভে 'গীতাতত্ত্ব' প্যাণ্ডেলে ৩দিন বক্তৃতা হইয়াছিল।

"যিনি সন্ন্যাসী তাঁহার জাতি নাই, তাঁহার জাতি নষ্ট হইবার ভয় নাই। সন্ন্যাসীর জাতিকুল ঘৃণা লজ্জা ভয় নাই।"

"তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহা নাই। সুতরাং তাহা কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না। সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও মায়িক, নির্বাণপ্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে তাহাই মায়িক। সমাধি অবস্থাও মায়িক। নির্বাণও একটী ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না।"

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয় অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য ব্রহ্মাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। বৃহত্তর আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ জ্যাকেটসহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সহ ১২·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয় মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	সন্ধ্যাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	২·০০		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	২·০০	Soul of India speaks	৭·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭৫·০	বাংলার কবি	৭·৫০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীলীলা ঘোষ এম. এ বি টি

ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৩·০০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিদ্যাসাগর	৩·০০		

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
৪ ঋতুর স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রে সি ডে সি লা ই ব্রে রী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

কৃষ্ণকে কৃষ্ণির মধ্য উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষ্ণিহীন কৃষ্ণার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ।

। মুদ্রিত ।

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	৫·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	১১·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৯·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	৫·০০
৩।	কেনোপনিষৎ	২·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৫·০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	৬·০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	২·০০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯	শ্রীনিত্যগোপাল—দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·৫০
১১।	গীতাজয়ন্তী	০·৬০
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	০·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠন-মূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (খাদী আরকমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।	
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১১·০০

। পাণ্ডুলিপি ।

১।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ঈ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
২।	দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

। ৺ লতিকা রায়ের ।

১।	নারী-প্রগতির ভূমিকা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য শিক্ষা	
	নিত্যগোপাল চক্রবর্তী ও তাঁহার কথা	০·৩১
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

। শ্রীমতী রেণু মিত্রের ।

	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	১·০০
	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
	শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েণ্ট বুক কোং প্রকাশিত

৪।	রবীন্দ্র ইন্দিরা	৫·০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি, অশ্বিনীনগর, (ডাঃ—জগবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা ৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার। C/o বে, বি, লাইব্রেরী। হাওড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত

নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ।

[illegible] সময়ে । আত্মা-অনাত্মা সময়ে

জ্ঞান অজ্ঞান সময়ে সাকার-নিরাকার

'আমি বিশ্ব-নাগরিক' সময়ে আকার-নিরাকার সময়ে । 'এই বিশ্বই আমার মনোরাজ্য'

আকার সাকার নিরাকার সময়ে ।

ভেদ-অভেদ সময়ে । চৈতন্য-

অচৈতন্য সময়ে । দ্বৈত-

অদ্বৈত সময়ে ।

সহ সময়ে" ।

[illegible] সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

...পীকার করে যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তম-বস্তুকে নিত্য জীবনে আস্বাদন করা বা নিজে আস্বাদন হওয়া এবং এই সাধনার সিদ্ধি যে গুরু-শিষ্যের একাত্মতাবোধ ও গুরু ও শিষ্যের এক-তনু হইবার সম্ভবপর, তাহাও বলা হইল শিষ্যের যদি পুত্রের হয় তাহারা একাত্ম বলিয়া, স্বামীর যদি স্ত্রীর হয় একাত্ম বলিয়া, গুরুর জীবনের 'ইষ্ট-বস্তু'ও শিষ্যের হয় তাহারা সবাই একাত্ম বলিয়া। গুরু-শিষ্য দুই মিলিয়াই এক অখণ্ড পুরুষোত্তম-বস্তু। গুরু শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্যই দীক্ষা দেন না গুরুর আত্ম-আস্বাদনের জন্য, কিন্তু আস্বাদনের চমাই শিষ্যকে আস্বাদ করেন। নিজেকে পাইলেই পাওয়া হয় না, যতক্ষণ না নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বকে নিজের মধ্যে না পাওয়া যায়। নিজ ও বিশ্বকে মিলাইয়াই তো সমগ্র বস্তু। শিষ্য করার অর্থই বিশ্বের মধ্যে নিজের আস্বাদন। ইহাই সহজ অবস্থা। আমি বিশ্বের ও আমার মধ্যে শিষ্যই সত্য আমি। শিষ্য গুরুর ধ্যানের বস্তু, যেমন গুরু শিষ্যের। গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক ধ্যানের মধ্যেই পুরুষোত্তম-সাক্ষাৎকার।

উজ্জ্বলভারত

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৮

বুদ্ধ-প্রণাম

বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে—৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সোমবার ভারতবর্ষে চিরপ্রধান সভ্যতার প্রতিবাদ ভগবান বুদ্ধকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম জানাইতেছি। বুদ্ধদেবের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ বিগত ২২শে মে ১৯৭৬ শনিবার কলিকাতায় ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত শ্রীশ্রীনিতাগোপালের মহা-সমাধি ক্ষেত্র মহানির্বাণ মঠে সন্ধ্যা সাতটায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

"শ্রীমৎ স্বামীজি বলেন, আড়াই হাজার বৎসর আগের বুদ্ধদেবকে আজ আমরা আবার এত ঘটা করিয়া স্মরণ করিতেছি কেন? তাঁহাকে ভুলিয়া ছিলামই বা কেন, আবার স্মরণ করিবার প্রয়োজনই বা হইল কিসে? আর এত কাল পরে বুদ্ধদেবকে যে ভারতবর্ষ এমন করিয়া স্মরণ করিতেছে, এ স্মরণ কাহারা করিতেছে? বুদ্ধদেব কি রাষ্ট্র ক্ষেত্রেই শুধু পূজা পাইবার যোগ্য? তিনি কি অধ্যাত্মক্ষেত্রের কেউ নন? অধ্যাত্মক্ষেত্রের কুম্ভমেলা বুদ্ধকে স্বীকার করিবে কি? বেদান্তের ভাষ্য লিখিতে গিয়া যাহারা বুদ্ধ-মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন, যে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক', যে অভিধানে পাষণ্ড শব্দের অর্থ লেখা আছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই তাঁহারা কি বুদ্ধদেবকে চাদর খুলিয়া স্বীকার করিবেন? বুদ্ধদেবকে সত কালের স্বীকৃতি দিতে হইলে কি অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাঁহার স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই? শ্রীনেহরু ও শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণের দ্বারাই কি বুদ্ধ ভারতবর্ষে টিকিয়া যাইবেন? শ্রীনেহরু ভাষণ দিলেন, খুব ভাল কথা—রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে—কিন্তু কুম্ভমেলার কোনো বড় সাধুর ভাষণ, তাঁহাদের প্রাণ খোলা স্বীকৃতির কি প্রয়োজন নাই! আমরা দৃঢ়ভাবে বলিব অবশ্যই আছে। ভারতবর্ষের মত দেশে কোন দিন শুধু রাজনৈতিক স্বীকৃতিদ্বারা মানুষের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করা যাইবে না—বুদ্ধদেবকে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মক্ষেত্র হইতে, বেদান্তের মাধ্যমে—যে বেদান্তের ভাষ্যদ্বারা তাঁহার নিরাকরণ করিয়াছিলাম-সেই বেদান্তের ভাষ্যদ্বারা—স্বীকার করিলেই শুধু ভারতবর্ষে তাঁহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বুদ্ধদেবকে ভারতবর্ষ বিতাড়িত করিয়াছিল কেন? পাঁচ হাজার বৎসর আগে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে সামগ্রিক জীবন-দর্শন লইয়া আসিয়া একটি অনিন্দ্য সুন্দর জীবন বিশ্বের ভাণ্ডারে জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও দর্শনের সেই সামগ্রিকতাকে হারাইয়া

ফেলিয়া মানুষ তাহাকে ভাগ ভাগ করিয়া যে যাহার পছন্দ মত করিয়া লইয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসকে মোটা-মুটি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে স্থিতিপ্রধান শঙ্কর, অপর দিকে গতিপ্রধান বুদ্ধ। ভারতবর্ষের এই দুইজন চিন্তানায়ক একেবারে পরস্পর বিরুদ্ধ। বুদ্ধ বলেন, 'যৎ ক্ষণিকম্ তৎ সত্যম্, ক্ষণিকেঽপি একত্বাদি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা।' অপর পক্ষে শঙ্করাচার্য বলেন, প্রতিটি ক্ষণ মিথ্যা, বাল্য কৈশোর যৌবন কোনটাই সত্য নয়, সত্য শুধু আত্মা যা continue করে; যাহার দীর্ঘ স্থায়িত্ব নাই তাহার সত্যতা নাই—চিরন্তনতাই সত্য; যাহা নিত্য নব নব তাহার কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। একের পক্ষে যাহা সত্য, অপরের পক্ষে তাহা মিথ্যা; একের পক্ষে যাহা মিথ্যা, অপরের পক্ষে তাহা সত্য—অর্থাৎ দুইজন diametrically opposite। এই অবস্থায় যখন যাহার গায়ের জোর বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন তিনিই টিকিয়াছেন, অপর পক্ষকে অভিভূত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডের আচারবহুল শাস্ত্র যখন মানুষকে ডুবাইয়া আচারের অত্যাচার সুরু করিল, তখন সেই আবেষ্টনেই বুদ্ধদেবকে জন্ম দিয়াছিল। স্থিতির এক রকমের অত্যাচারে পীড়িত ভারতবর্ষে প্রাণের গতি প্রবাহিত করিয়া বুদ্ধদেব মুক্তির বার্তা শুনাইয়া ছিলেন। মানুষ যখন একান্তভাবে নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া উঠিবার সাধনায় ব্যস্ত হইয়া মানুষকে ভুলিল, ভগবানের করুণার মাহাত্ম্যকে প্রচার করিতে যাইয়া যখন নিজের সাধনা ভুলিল, গুরুকারকে ভুলিল, সেই সময় মানুষের দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষকে দেখিবার সাধনা লইয়া আসিলেন ভগবান বুদ্ধ। সত্য প্রেম পবিত্রতা অহিংসা —ভারতবর্ষের কাছে এগুলি নূতন কথা নয় —পাতঞ্জলের মধ্যে এ সবই আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু সেগুলি ছিল নারায়ণকে পাইবার পথ। কিন্তু বুদ্ধদেব আনিলেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ঈশ্বর আছেন কি নাই এ সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া আচারী জাতি কুল শীলের অত্যাচার ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, মানুষ হও। তুমি যে কোন জাত-কুলশীলের হও না কেন, হও না কেন তুমি ধনী বা নির্ধন, উচ্চবর্ণ কিংবা নিম্নবর্ণ, পণ্ডিত বা চাড়াল কিংবা যা কিছু—তুমি মানুষ এবং প্রত্যেকেরা তুমি মানুষ হইতে পার। 'আত্মদীপো ভব'। এই যে মানুষের দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষকে দেখা—ইহাই বুদ্ধের বিশেষ কথা এবং এই দেখা হইতেই আসে তাঁহার গতিবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদ। বুদ্ধদেব তো মুক্তি চান নাই, ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যও তিনি সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি মানুষের দুঃখ দূর করিতে সন্ন্যাসী হইয়াই গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দুঃখ দূর করিবার পথ হিসাবে অহংকারের পরিনির্বাণের দ্বারা সঙ্ঘ গঠনের মধ্য দিয়া পরম মৈত্রী করুণা ও অহিংসার পথ বলিয়া গিয়াছেন। ভাগবতও এই মানুষের দৃষ্টিকোণ হইতেই মানুষকে দেখিয়াছিল, মহাত্মা রন্তিদেব ও ভক্তবর প্রহ্লাদের কাহিনীর মধ্যে তাহা নিতান্ত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে। আর আজ পাশ্চাত্যের মার্ক্সও বলিয়াছেন, 'man is the measure of all things।' রন্তিদেব, বলা চলে, কৃষ্ণ-প্রপন্ন নন, তিনি মানুষের দুঃখের প্রপন্ন। বুদ্ধদেবও তেমনি মানুষের

দুঃখ দূর করিবার জন্য বাহির হইলেন এবং বোধিসত্ত্ব লাভ করিয়া বলিলেন, এই জগতে সঙ্ঘ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজের পুরুষকারের দ্বারা সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, সৎ সংকল্প প্রভৃতির আচরণ করিয়া মানুষ নিজের দুঃখ দূর করিতে পারে।

জগতের ওপারের নারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে অভ্যস্ত ও স্থিতিপ্রধান চিন্তা-ধারার উপাসক ভারতবর্ষের কাছে মানুষের কথা বলিয়া ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের গতির কথা বলিয়া বুদ্ধদেব এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই গতি আজ পাশ্চাত্যের মধ্য আসিয়া পড়িয়াছে—আজ আবার শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন-দর্শনকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য শঙ্করের স্থিতি ও বুদ্ধদেবের গতির সমন্বয় করিতে হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনের একদিক প্রকাশ করিয়াছেন আচার্য শঙ্কর, অপর দিক প্রকাশ করিয়াছেন ভগবান বুদ্ধদেব। ইঁহারই দর্শন বর্তমান সময়ে বর্তমানের ভাষায় দিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল তাই তিনি লিখিয়াছেন 'সমন্বয়, নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয় দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্বসমন্বয় শ্রীনিত্যগোপাল পরস্পর-বিপরীত এই যে কয়েকটি বিশেষ অর্থদ্যোতক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদেরই একটি ভগবান শংকরাচার্যের দৃষ্টি-ভঙ্গি, অপরটি ভগবান বুদ্ধের। এই দুই দৃষ্টি-ভঙ্গির সমন্বয়ের কথাই বলিয়া শ্রীনিত্যগোপাল নবীন শংকর, নবীন বুদ্ধ। যাহা হউক, গতিকে বাদ দিয়া, মানুষকে বাদ দিয়া শুধু নারায়ণকে পাইতে যাইয়া, শুধু স্থিতির উপাসনায় ভারতবর্ষ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যে কোন রকম সংগঠনের শক্তি সঙ্ঘ-শক্তি, সৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া পরের গোলামী করিতেছে, অপর দিকে স্থিতিকে একেবারে বাদ দিয়া, নারায়ণকে একেবারে নেপথ্যে রাখিয়া শুধু মানুষকে ধরিয়া বুদ্ধ-দর্শন শেষ পর্যন্ত আচার্য রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় 'devil's dance'-এ পরিণত হইয়াছে। এই দুই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্যই সামগ্রিক কৃষ্ণ-দর্শনের ও কৃষ্ণ-জীবনের প্রয়োজন—আর তাহারই জন্য জড়াজড়, স্থিতি গতি সমন্বয়ের শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ও জীবন।

বুদ্ধদেবের এই পুনরাগমন আজিকার ভারতবর্ষে, আজিকার বিশ্বে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে; কেমন করিয়া তাহা সম্ভব ও সার্থক করা যায় তাহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের দৃষ্টিতে বেদান্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছি ভগবান বুদ্ধের আগমন সার্থক হউক, তাঁহার মানুষের সহিত মানুষের মিলনের বাণী সফল হউক। বন্দেমাতরম্।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(১৯৫৩)

তি তিনটি ঘণ্টার উপর বলিয়াছি। বরোদায় ছিলাম পান্নালাল ঠাকোরীলাল মুন্সীর বাড়ীতে। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বক্তৃতার দিন দিন উন্নতি হয়। নর্মদাপ্রসাদ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বামিজী, বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ। উহাদের চোখে খুব জল। এখানে বুঝি চোখের জল ফেলেন! এ কঠোর কর্মের দেশ, মহাত্মা গান্ধীর দেশ' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দেশের মানুষ মরিলে কাঁদে তো? নর্মদাপ্রসাদ বলিলেন 'তা কাঁদে বই কি'। আমি বলিলাম, 'যখন কাঁদেই, তখন বক্তৃতায়ও কাঁদিতে পারিবে'। ঠিক তাহাই হইল। বরোদার এত দিনের বক্তৃতার শেষে আমার প্রাণ, দৃষ্টা ও অশ্রুপাত সকলকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহারাও আমার সঙ্গে যোগ দিল নারিকেল ভোগ-দেওয়া হইল। আমি কোল দিতে লাগিলাম তাহারা সরিয়া যাইতে থাকে। সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিবে? সন্ন্যাসী যে নারায়ণ! আমি ধরিয়া ধরিয়া কোল করিয়া কোল দিলাম ও নারিকেল খাওয়াইয়া দিলাম। রেণু ১৪ টায় বাহির হইয়া ৭॥ টার পর ফেরে। ১৫০০৲ টাকার উপর আদায় করে। ডাকার পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্যবাবু নরনারায়ণ আশ্রমের জন্য ৪৮৲ টাকা আদায় করিয়া দিয়াছেন। নীলু এক কাড় দিয়াছে ১০০ ১০ টার পর নারায়ণদাস নন্দী ও আত্মবাবু (নিগমানন্দজীর শিষ্য) আসেন। নাথীর সাধনা—সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বিশ্বরূপের সাধনা ও তাহার পর ছোর পর্যন্ত স্বরূপের সাধনার—analogy-তে ভগবৎ সাধনার কথা বলি। 'অভিলাষের গূঢ় অর্থ' পড়া হয়। নারায়ণবাবু গ্রাহক হন; সঙ্গাহ ভরা আসে। উজ্জয়ন্তভাবতের ১০৲ টাকা দেয়, আরতি করিয়া যায় ...৮ই ফেব্রুয়ারী

বরোদা সুরাট ও পেটলাদে বক্তৃতা দেই। সুরাটে যে বাড়ীতে থাকি (নাম মনে নাই) তিনি আমার নিকট হইতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ইহা ১৯১৯ সন হইবে। তখন আমি গৈরিকধারী। উহারা সন্ন্যাসীকে 'নারায়ণ' জ্ঞানে পূজা করেন। বাড়ীর গৃহিণী নারায়ণের মত আসনে বসাইয়া ধূপ দীপ দিয়া অর্চনা করিয়া স্তব খাইতে দেন। খালি হাতে কেহ দেখা করিতে আসে না। সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া ইহারা প্রণাম করেন না। আমি যখন সুরাটে তখন মহাদেব দেশাই লবন আইন অমান্যের ব্যাপারে মহাত্মাজীর জন্য সেখানে jail bed খুঁজিতে গিয়াছিলেন। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি আমার নাম পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। আমি দেখার পর গতই তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিতে যাই, তিনি হাত জোড় করিয়া ততই পিছনে সরিয়া যান। বুঝিলাম,

হইয়া কোলাকুলি পছন্দ করে না। নর্মদা-প্রসাদ পাণ্ডে ইহাই বলিয়াছিলেন—কলকাতাপনা দেশের লোকেরা বাঙালীদের মত ভাবপ্রবণ নন। বরোদা হইতে সুরাট, সুরাট হইতে বরোদা ১ বার যাতায়াতে করি বরোদায় ৪ দিন, সুরাটে ১৮ দিন, পেটলাদে ২ দিন বক্তৃতা হয়। পেটলাদ নর্মদার তীরে। বরোদায় আমাকে কেন্দ্র করিয়া 'ব্রহ্মবন্ধু সোসাইটি' হইয়াছিল। তাহারা আমাকে রাখিয়া আশ্রম, বাড়ীঘর, মোটর করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আমি নবীন আইন অমান্যের জন্য বাঙ্গলায় আসিলাম। বরিশাল যাইয়া War council-এর dictator হইলাম। ৮০ মাইল যাইবার পর বলচিড়া গ্রামে গ্রেপ্তার হই। রেণু সকালে বাহির হইয়া মণি সেন, দেবব্রত রায়চৌধুরীদের কাছে যায়। সত্যব্রত রায় ১০৲ টাকা দেন। আর বাহির হয় না। চক্ষু কাটাইবার জন্য উষাঙ্গিনী কাল হাসপাতালে গিয়াছে, ভাল আছে। কাল্গুনের জন্য 'কর্ম-রহস্য' প্রবন্ধ শেষ করি। অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছে। দেবর সভাপতি। কুসুম ও মিনুর কাছে প্রতিভা পত্র দেয়, বাড়ী আটি ঘর উঠিলে কাহারও সেখানে থাকা দরকার নচেৎ ঘরগুলি নষ্ট করিবে। কে থাকিবে? আমার কে আছে? 'অভাব' আমার জীবনে এক পরম সত্য 'ধ্রুব'। ১৪ ফেব্রুয়ারী

বৈশেষিক দর্শনের 'অভাব' বস্তুটি পুরুষোত্তম দর্শন ও জীবন ব্যাখ্যান ও আস্বাদনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিটী গুণ গুণাভাবযুক্ত, প্রতিটী কর্ম কর্মাভাবযুক্ত, একত্বে রহিয়াছে একত্বাভাব, পৃথকত্বে পৃথকত্বাভাব। এই ভাবে ঈশ্বরে আছে ঈশ্বরাভাব, জীবে আছে জীবাভাব, বিষয়ে আছে বিষয়াভাব। প্রতিটি বস্তু এইভাবে সে ও তাহার অভাবদ্বারা সংঘটিত। বস্তু ও বস্তুর অভাব সমন্বয়ই প্রকৃত পুরুষোত্তম-বস্তু। একে যখন একাত্মবোধ ও পৃথকত্বে যখন পৃথকত্ব অভাব আস্বাদিত হয়, তখনই হয় এক ও বহুর সমন্বয়। সংসারে রহিয়াছে সংসার অভাব, সন্ন্যাসে রহিয়াছে সন্ন্যাসাভাব ভাগে আছে ভাগাভাব, ত্যাগে আছে ত্যাগাভাব আকারে আকারাভাব, নিরাকারে নিরাকারাভাব রহিয়াছে এইভাবে হাঁ ও হাঁ-এর অভাবদ্বারা প্রতিটি বস্তু গঠিত। সতে আছে সৎ-এর অভাব, অসৎ-ও আছে অসতের অভাব। তাই সৎ অসৎ সমন্বয়। জড়ে আছে জড় ভাব, অজড়ে আছে অজড়াভাব, তাই জড়াজড় সমন্বয়। বস্তুর অভাব অংশই তো বস্তুর 'রস'। 'অভাব' আছে বলিয়াই 'পরিণাম' আছে। বস্তুতে তাহার অভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই বস্তু নিজের অতীত নিজে হইয়া পুরুষোত্তম-সত্তায় বিবর্তিত ও পরিণত হয়। বস্তু বস্তু থাকিয়াই বস্তু অভাব নিজে নিজ থাকিয়াই নিজের অতীত। ইহাই পুরুষোত্তম-বিশ্বের বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। এই ধর্ম বস্তুর আছে বলিয়াই কোনও বস্তুই কাহারও একচেটিয়া হয় না। প্রতিটী বস্তুই নিজের ও বিশ্বের কাছে পরকীয়। স্বামী নিজের ও বিশ্বের কাছে পরকীয়, স্ত্রী পরকীয়, পিতা পরকীয় পুত্র পরকীয়, ধন পরকীয়, কর্ম পরকীয়। শ্রীনিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন। আজ সকালে হঠাৎ অজিত ঘটক আসিয়া উপস্থিত। সে কোনও বন্ধুর সঙ্গে হাবড়া শ্রী পূজাদির স্থানে গিয়াছিল। ভাল নাই। এখনও সেই 'ইঙ্গিত' রহিয়াছে। বৈকালেও একবার আসে। রেণু ১২ টার পূর্বে বাহির হইয়া

প্রেসে কাগজের কপি দিয়া গর্গরি প্রভৃতির ওখানে যায়. হাসপাতালে উষাঙ্গিনীকে দেখিয়া সন্ধ্যায় আসে। ৮ টার পর .দবুর ওখানে গিয়া ৪৲ টাকা পরিকল্পনা বাবদ আনে। কিতীশ্রবাবু বৈকালে আসে। ১০ ই ফেব্রুয়ারী

'নৈষ্কর্ম্যম্ অপি অচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে' —অচ্যুতের ভাববর্জিত নৈষ্কর্ম্য শোভা পায় না। কেন? নৈষ্কর্ম্য তো work-strike। মায়ার রাজ্যে, কর্মের রাজ্যে থাকিয়া কর্মকে ভিত্তিমূল রাখিয়া কর্ম-ত্যাগ আত্মহত্যার সামিল, যেমন রাজনীতিতে কর্মীরা দলবদ্ধ হইয়া ধনিককে জব্দ করিবার জন্য, ধনিকযন্ত্রকে অচল করিবার জন্য কর্ম ত্যাগ করে। ইহাদ্বারা কোনও গঠন হয় না, কর্ম-দেবতাকে অবমাননাই করা হয়। কিন্তু কর্মকে যদি God centred করিয়া 'ভজনে' রূপায়িত করা যাইত, তবে মায়া-কাঠামো রূপান্তরিত হইত; কর্মদ্বারা মায়ার শোষণ-ভীতিও দূর হইত। ভক্তির মধ্যে 'work-strike' ও 'কর্ম' দুইয়ের সমন্বয় রহিয়াছে। ইহা বিপ্লবাত্মক বলিয়াই গঠনাত্মক। ইহাদ্বারা অখণ্ড (indivisible সমাজ-জীবন সার্থক হয়। কর্মীরা কর্ম ত্যাগ করিয়া 'are defeating their own causes'। কর্মত্যাগ শ্রমিক মজুরদের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। কর্মত্যাগ সাত্ত্বিক পন্থা যদি না হিংসা আসিয়া পড়ে। কিন্তু দেশকে ভালবাসা নির্গুণা ভক্তি। দেশপ্রেমের মধ্যে নৈষ্কর্ম্য কর্মের সমন্বয় রহিয়াছে। দেশ-প্রেমই যোগমায়ার দান। শ্রীনিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন। রেণু সকালে বাহির হইয়া মণি সেন ও হিন্দুস্থানের চেক লইয়া ফেরে ১টার পর। আর বাহির হয় না। অজিত আসে। ...শেষে কারনানী হাসপাতালে উষাঙ্গিনীকে দেখিতে যাই। ভাল আছে। আজ ১১ টায় অপারেশান হইয়াছে।

সন্তোষ চাটার্জী আসিয়াছিল। মাখনবাবু আসিয়াছিল...। ১১ ই ফেব্রুয়ারী

পুরুষোত্তম নির্গুণ বলিয়াই তাঁহার প্রতি গুণের সহিত সম্ম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় বলিয়াই প্রতি কর্মের সহিত তাঁহার সম্ম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি সর্ব গুণান্বিত নির্গুণ, সর্বক্রিয়া সমন্বিত নিষ্ক্রিয়। তাঁহাতে গুণ-কৌলীণ্য আশ্রম-কৌলীণ্য বা কর্ম-কৌলীণ্য নাই, কোনও রকমের hierarchy বা ladder system নাই। তাই 'যৎ করোষি', 'অপিচেৎ সুদুরাচারো', 'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য' প্রভৃতি শ্লোকের সার্থকতা। প্রথম শ্লোকের 'যৎ' পদের অর্থ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস কর্ম। চিত্তের সাত্ত্বিক রাজস তামস বৃত্তিদ্বারাও তাঁহার ভজনা হয়। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-র তারতম্য জৈব বুদ্ধির বিভাগ, বিচার। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ক্ষমতা নাই গুণসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস স্থাপন করে। সেই ক্ষেত্রেই সত্ত্বগুণের ক্ষেত্র যেখানে গুণত্রয় পরস্পরকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। দ্বৈত সমরে নিযুক্ত নির্গুণ-ক্ষেত্র গুণত্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র, অন্যোন্য-নিরপেক্ষ, অথচ অন্যোন্যাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্বের বিগ্রহ। তিনিই আমার শ্রীনিতাগোপাল। ৪৫০ বৎসর পূর্বে তিনিই আসিয়া ছিলেন গৌর-গোপালরূপে। শ্রীনিতাগোপালই আমার মনোময় প্রাণময়ীর নেতা, হৃদয়বিহারী, গুরু বন্ধু নাথ। আমি তাঁহারই সত্তা চৈতন্য-আনন্দে আত্মসমর্পণ

করিতেছি। তিনি আমি এক, অদ্বৈত, একাত্ম। নীলু আসে সকালেই—পাঠের পর যায়। নীলরতনবাবু 'ভক্তিযোগ দর্শন' পাঠের পর যান। রাজেন ও বিষ্ণু আসে। তাহারা বাগুইআটি যাইতে প্রস্তুত। সন্তোষ আসে। আলোচনা মোট করে রাসের বাস্তব ব্যাখ্যা হয়। প্রেম গোলোকের নিত্য বস্তু। মহাপ্রভু তাহা সাধারণ লোকেদের মধ্যে আনিয়াছেন। নিত্য অনিত্য সমন্বয়। গোলোকের বিরহের সঙ্গে নিত্যপ্রেমের যোগ নাই। পার্থিবী লীলায় বিরহ আছে। জৈব কামকে অজৈব প্রেমে রূপান্তরিত করার কৌশল (technique) ব্রজে শিখানো হইয়াছে। যুধি স্থির যে সাহস পান নাই, শ্রীকৃষ্ণ সেই কামের দিশা রূপ স্থাপন করিলেন। নীলু গান গায়, উষাঙ্গিনী হাসপাতালে, ভাল আছে। ১২ ফেব্রুয়ারী

ভাগবতের রাসলীলা আত্মা অনাত্মার যোগ দেখাইবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আপত্তি নাই কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার জন্য প্রাকৃত নরনারীর কামক্রীড়া বর্ণনার কি খুব উপযোগিতা আছে? উহা দ্বারা মানুষের জৈব কামের খোরাকই যোগান হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, জৈব কাম কোন psychology দ্বারা অজৈব প্রেমে পরম প্রেমে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত রাধাগোবিন্দ জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে পরীক্ষিতের স্বপ্নের যে উত্তর শুকদেব দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক কোনও দিক দিয়াই অন্যায় আচরণ করেন নাই। গোপীগণ যখন রাসে গিয়াছিলেন, তখন যোগমায়ার কৃপায় স্বামীরা দেখিল যে তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের কাছেই আছেন। স্বামী-সেবার সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবার বিরোধ তো নাই-ই, বরং কৃষ্ণ-সেবা স্বামী সেবার মাধুর্য আরও বাড়াইয়া দেয়। তাই স্বামীদের হিংসা করিবারও কিছু থাকে না। পারিবারিক শৃঙ্খলাও নষ্ট হয় না। রাসে কৃষ্ণ বা ব্রজগোপীগণের 'error of omission' হয় নাই প্রাকৃত স্বামীদের পত্নী অর্থে, শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সমগ্রের। বিরোধ নাই। জয় নিতাগোপাল। সকালে কিশোর চক্রবর্তী আসে। টাঙ্গাইলের অনেক বিশিষ্ট লোকের কাছে 'সমন্বয়-মূর্তি নিতাগোপাল'-এর G. C. M. ও L. C. M., ঊর্ধ্বমুখিই অনুরূপ ইহা খুব ভাল লাগিয়াছে। সে নাকি অনেক শিষ্য করিয়াছে নীলুর কাছে শুনিলাম। তাহাকে ২ খানি 'সমন্বয় মূর্তি' (শতবার্ষিকী), ১ খানি 'জীবনে ও দর্শনে' দেই। অজিত ১ বেলা আসে। kali phos 12x, kali mur 30x, calphos 30x, S 30x কেনা হয়। আগে সে সুস্থ হইবার চেষ্টা করিবে, সুস্থ হইলে তবে কাজকর্ম। রেণু ১ টার পর বাহির হয়, ফেরে ৬ টায়। জ্যোতীশ বাবুর ওখানে চড়তে কোন করিবে স্থির হয়। এস সরকার, এস বি সরকার প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে। উষাঙ্গিনী ভাল আছে, আমাকে যাওয়া হয় নাই। ১৩ ই ফেব্রুয়ারী।

জীবনকে জীবন দিয়াই বুঝিতে হয়, পাইতে হয়; কোনও বিশেষ গুণ বা কর্ম আশ্রয়ে বোঝা যায় না। জীবন নির্গুণ, সকল গুণেই সে বিচরণ করিতে পারে। 'পুণ্যেন পুণ্যঃ ভবতি পাপেন পাপ ভবতি'। তাই নির্গুণকে ধরিয়াই সগুণকে

বোঝা যায়, প্রতি গুণের আস্বাদন লাভ হয়। নির্গুণের আস্বাদনই সত্য; কেননা আস্বাদন বিচিত্র। জীবনকে ধরিয়া, জীবনের প্রতি বিকাশ ঐ বুদ্ধিনিচয়কে আশ্রয় করিয়া বস্তুর নির্গুণ সত্তাকে বিচিত্র রকমে আস্বাদন করিতে হইবে। বিশ্বের প্রতিটী বস্তু গুণ কর্ম নির্গুণ। 'We pass from whole to whole'। নির্গুণের সঙ্গে প্রতিটী গুণের সম্ম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই ওঁকারেরও নির্গুণ কৃষ্ণ-ভজন, রাধা-ভজন, শিব-ভজন সম্ভব হয়। নির্গুণ সকল গুণের জ্ঞেয়। নির্গুণ প্রতি গুণের সাক্ষী। দুইটী গুণের যোগসূত্র নির্গুণ; গুণগুলির সমন্বয় নির্গুণ। নির্গুণের সকল standpoint হইতে উপলব্ধি করা যায়। জীবের প্রতিটী বৃত্তি নির্গুণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে হয় তাহার ক্রীড়া। নির্গুণ মূল, সগুণ তাহার স্কন্ধ, শাখা প্রশাখা, ফুল-ফল। জীবনই নির্গুণ। আমি ইহারই উপাসক। রেণু গটাং বাস্তুহারাটি যায়, প্রথমে ভূপতিবাবুর বাসায়, পরে তৎপর অতুলবাবুর বাসায়; ভূপতিবাবুর বাড়ী যাওয়া, আসিয়া যাওয়া ইত্যাদি সারিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাসের ভাড়ার শাখা হইতে শ্যামবাজার শাখায় এক চিঠি দিয়া আসে বাস্তুহারাটিকে ১ মাসের মধ্যে পাকের ঘর-সহ একটি নূতন ঘর, কোঠার সম্পূর্ণ করিয়া দিবে বলিল। সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মণ্ডল আসে তাহার আমাদের ধর্মের বুকিবার যোগ্যতা আছে কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে সমা লোচনা করিবার সুবিধা। কোথায় কোন মতের সে পুরুষোত্তম-দর্শনের দৃষ্টিতে এসব তাহে তাহা বেশ বোঝে কিন্তু উহা তো গঠনাত্মক হইল না, জীবনগত হইল না। সঙ্গে আরও একটি যুবক আসে।..... ১৪ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমিই আমার এই অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারা। 'শরৎ যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি' — এই বাণী আমার সারা জীবনের সম্বল। কাণায় তুমি নিয়া চলিয়াছ তুমিই জান। ধন বল, জন-বল কিছুই আমার নাই। তুমি যদি টাকাকড়ি মানুষ দিয়া কাজ করাইয়া লও, হইবে। আমার বল কিছু নাই। বাস্তুহারাটি যাইবার প্রস্তুতি করিতেছে। আমার ছেলের জন্ম ভাবনা নাই, বইগুলির জন্ম আমার যথেষ্ট ভাবনা। ঐগুলি আমার প্রাণ, উহারাই আমার সন্তান। উহাদের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিব। বুকের ভিতর উহাদের পাইয়াছি। আর করা কিছু তো লিখি নাই। উহা আমার ও তোমার নিজস্ব তোমার মূলসূত্র অর্থাৎ বীজ আমি গড়ে ধারণ করিয়াছি, amplify করিয়াছি। কি হইবে, কেমন করিয়া হইবে তুমি ভাবিও। আমার ভাবিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, বিকৃত ভাবনা মাত্র। ১৯১৯ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে তুমিই হাত ধরিয়া নিয়া আসিয়াছ। নয়তো কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইতাম। পাপে পাপে তুমিই তো ঝাপাইয়া নিয়া আসিয়াছ। যখন যাহা দরকার তুমি যোগাইয়া দিয়াছ। তুমি আছ আমার। অভিত আসিয়া চলিয়া যায়। রেণু কুমারেশ বাস্তুহারা হইয়া ফেরে ওঠায়। মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের হিসাব বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ টাকা ইউ বা-এ ট্রান্সফার হয়। ওগেন ঘোষ (উজ্জ্বল ওরফের প্রাক্তন আমার গীতা-ব্যাখ্যার খুব আকৃষ্ট হইল) বৈকালে আসিয়া ১খণ্ড করিয়া ঈশ ও কেন উপনিষৎ তাহাকেও উপহার দিবার জন্ম নিয়া যান। তিনি বলেন, 'আপনার ব্যাখ্যা পড়ার পর অন্য ব্যাখ্যা ভাল লাগে না। মনে হয় শ্রীনিতাগোপাল is the greatest

man'। কর্পোরেশনের কোনও বিচারককে বলিয়াছেন 'আপনার প্রচলিত গীতার ব্যাখ্যা ভুল', আমি বলিলাম 'আপনি আমার সত্তা-কার গুরুভাই'। সন্ধ্যার বৈকালে একবার আসে। সে পুরোহিতগিরি করে। বাস্তুটাটিতে ও বাইতে পারে, কি কি করিতে পারে তাহার আলোচনা হয়। প্রতিভা বিমলার বাসায় যায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী

মহাকালী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী আমার শ্রীরাধা! তুমি অযাচিত কৃপায় তোমার বিপ্লবময় জীবন ও বেদ-বেদান্ত-গীতা-ভাগবতের ভাষা লইয়া আমার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ আমার আমি রূপে প্রকাশিত হইয়াছ, দেখাইয়াছ যে আমি তুমি এক হইয়াও ভাবে গোবিন্দের পাশে দাঁড়াইয়া। তোমার কৃপায় তোমার সরস্বতীরূপের সত্য বাস্তব পূজার অধিকার পাইয়াছি। নরনারায়ণ আশ্রম তোমার বিপ্লবা-রূপের পূজার উপলক্ষি গীতার বিপ্লবময় ভাষাদ্বারা করিবে। একথা উপলক্ষি করিতেছি যে, যে ভাষা আমি পাইয়াছি তাহাই বর্তমান যুগের ভাষা ভবিষ্যৎ যুগের পরিবার সমাজ রাষ্ট্র এই ভাষায়ই কথা কহিবে ইহাই ভবিষ্যতের দ্বিতীয়বেদের ভাষা, দ্বিতীয়ী প্রভাষা। তোমার ভাষা 'দয়া তোমার সেবা করিব। তুমি আমার আমি তোমার, তুমি আমি আমি তুমি। "নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমো"। তোমায় নমস্কার, আমাকে নমস্কার, তোমাকে আমাকে বিশ্বকে নমস্কার। ইহাই পরিপূর্ণ জীবনের ভাষা, শ্রীনিতাই-গোপালের ভাষা। মহানগরীর প্রান্তে ঘরের এক কোণায় বসিয়া আমার প্রাণের সেবা গ্রহণ কর। এই সেবা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ুক। নীচে 'সরস্বতী' সম্বন্ধে পড়ি হয়, আমি আলোচনা করি। উহারা অতুলি দেয়। 'আমি সরস্বতীর বরপুত্র'। বাগদেবী তাকিয়াছিলেন চোখ বুজিয়া, পরে চক্ষু পাইলেন আমিও বোবা হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলাম, পরে বাক্য পাইলাম বাক বৈ সরস্বতী। আমার বাক্যের পিছনে আছে মায়ের তপস্যা তপস্যায় পাওয়া আমার এই বাক্য যেন অনুপলব্ধায় বিকার প্রাপ্ত না হয়। শ্রীরাধা সরস্বতীর বরে আমি উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র গীতার ভাষা পাইয়াছি। এমন বর কতজন পায়? সরস শব্দের অর্থ জ্যোতি, তেজ অর্থাৎ বাক এবং রস। সরস্বতী বাঙ্ময়ী ও রসময়ী নীতের জড়তা ও বসন্তের প্রাণ সঞ্চারের যোগসূত্র তিনি ঋতুরাজের চরণে আবির দেওয়া হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী।

আমার জীবনে প্রথম হইতে শ্রদ্ধা আবিবেশ, যেমন নচিকেতার হইয়াছিল। বিশ্বাস করিয়াছি অথচ বিচারকে বিসর্জন দেই নাই। বিচার করিয়াছি বিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়া নয়। মূলে সত্যের প্রতি গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই এরূপ পারিয়াছি। আমার বিচার যতই সূক্ষ্ম হউক, পরিচ্ছিন্ন তো বটে, কাজেই বিশ্বাসের ক্ষেত্র থাকিয়াই সাইতেছে। আবার বিচার না থাকিলে কোনও জিনিষই নিজের করিয়া লওয়া হয় না। "ন তৎ অস্তি ন যন্ত্রাহম্"—যেখানে আমার বুদ্ধির প্রসর নাই, তাহা তো নাই পদবাচ্য। স্কুলে যখন পড়িতাম তখন দুর্গা-পূজার সময় মায়ের সামনে বসিয়া গোপাল চক্রবর্তীর টীকা সহ শ্রীশ্রীচণ্ডী পড়িতাম। টীকা অবশ্য সব বুঝিতাম না। আমি ছিলাম বালা কৈশোর যৌবনে ঘরের মানুষ, ঠাকুরের স্পর্শ

পাইবার পরই বুঝি বাহিরকে চিনিয়াছি। ঘরকে ছাড়িয়া বাহিরে আসি নাই। তাই বাহির আমাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই। ঘরকে ঘর বলিয়া ঘরের সম্বন্ধের সঙ্গে বাহিরের সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছি। বর্তমানে কি দেখিতেছি? 'ঘর' বলিয়া ইহাদের কিছু নাই, ঘর ছাড়িয়া তাহারা বাহিরে নামিয়াছে। আগাগোড়া সব বহির্মুখী, ঘর উজার হইয়া গিয়াছে। ঘরের প্রতি কোন টান নাই। ঠাকুর, কে ইহাদের মাঝে শিখাইবে তুমি ছাড়া? ঘর বা বাহির কাহাকেও তো ছাড়া যাইবে না। চাই সমন্বয়, দুয়ের মাঝে জ্ঞান। তুমি ছাড়া গতি নাই। ডাঃ মেঘনাদ সাহা হঠাৎ কাল দিল্লিতে মারা গিয়াছেন। সরস্বতী পূজার দিন জগন্নাথ সাহার পাড়ার যুবকদের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছে। এতগুলি যুবকসহ জগন্নাথ সাহা মেঘনাদ সাহার মৃত্যু উপলক্ষে মাইক থামাইবার জন্য অনুরোধ করে। ইহা হইতে দাঙ্গার উদ্ভব হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠিয়াছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

বিশ্বের সর্বত্র সব ক্ষেত্রে গ্লানি দর্শন করিয়া একদিন অদ্বৈত তুলসী গঙ্গাজলে তোমার পূজা করিয়াছিলেন, তুমি আসিয়াওছিলে। আজিকার এই ধর্মগ্লানির মাঝে তুমি তো আসিয়াই আছ, তবে কেন আজও তাহার কোন নিদর্শন দেখিতেছি না? তুমি ছাড়া, নিতাগোপাল আমার, অপর যে কোন নূতন কেহ আসিবেন, তাহা তো বুঝি না। তোমার জীবন ও দর্শনের মত এত ব্যাপক জীবন ও দর্শন কাহার আছে যিনি এই বিশ্ব পরিপাক করিতে পারিবেন? বর্তমানের সকল বিষ তো জড় ও অজড়ের দ্বন্দ্ব সম্ভূত হইতে আজ। যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠিয়াছে। শ্রদ্ধা তাহাদের নাই—না পিতামাতায়, না দেবতায়, না কোনও পার্থিব কর্মে। বাহিরের উত্তেজনা তাহাদের এমনই অভিভূত করিয়াছে যে তাহারা ঘর ছাড়িয়াছে। উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চায়। কে এই উত্তেজনার সঙ্গে সাত্ত্বিকতার সমন্বয় করিয়া ইহাদের এই উচ্ছৃঙ্খল গতিকে রুদ্ধ করিবে? আমাকে শক্তি দেও, বল দেও, বীর্য দেও। তোমাকে জীবনে অর্পণ করিয়া গর্জন করিতে দেও। বিশ্বকে ঠেলিয়া এতটুকুও আগাইয়া দিবার মত বীর্য দেও। তোমার জীবনে জীবন লাভ করিব ইহার চেয়ে আমার অন্য কোনও শ্রেষ্ঠতর কামনা নাই। তোমার জয় হউক। সকালে সতোন শাস্ত্রী আসে। বহু আলোচনা হয়। ছাত্রদের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয়ে কথা হয়। এ স্রোতে ঠেকানো সম্ভব না হইলে সমাজ বাঁচিবে কি করিয়া? সরস্বতী পূজা হইয়াছে আজ তিনদিন চলিল। সামনে এক সরস্বতী মূর্তি ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। পৌত্তলিকরাও তো এমন করে না। পিতামাতার মৃতদেহের উপরে রোদ পড়িলে সন্তান মাথার ছাতা ধরে। এ দেশের সংস্কৃতি নষ্ট করিবার এক নূতন কৌশল নয় তো? প্রতি পাড়ায় এক এক সার্বজনীন! হায় সার্বজনীন! ঠাকুর, এই গতি রোধ করিবার মত শক্তি দেও। আমি তোমারই ধ্যানে বসিয়া আছি এই অন্ধকারের মাঝে। সুব্রত ও বাচ্চু আসে ২ টায়। রেণু সকালে বাহির হইয়া ২ টায় ফেরে। উবাশিশী কাল আসিবে। যমুনা আসে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী

ভূতসমূহ আনন্দ-বিজ্ঞান-মন-প্রাণ-অন্ন হইতে

অনুগ্রহণ করে—জানতে। কৃতসমূহকে বুকে করিয়া রহিয়াছে ঐ আনন্দ-বিজ্ঞান প্রভৃতি ইহাই জীবের ভিত্তিভূমি। এখানে অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ অন্যোন্যসক্ত এক অখণ্ড বিশেষ সত্তা। অন্ন ছাড়া আনন্দ হয় না, আনন্দ ছাড়াও অন্ন হয় না। এই মূল সত্তা ভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, ভূতের ভিতর দিয়া বাড়াইয়া আগাইয়া নিতেছে ইহার মধ্যে পাপত্ব, পাপকৃতা, পাপসম্ভাবনা আসিয়াছে উহমূল না হওয়ার জন্য সম্মূল হইলে পাপ পাপ থাকে না, পাপ হইয়া যায় গতির আস্বাদন জীবন ভিতর হইতে বাহিরে আসে, "Life is from within out" জীব যখন মানুষকে, তখন তাহার কাছে দেশ-কাল বাধা থাকে না। সে অবস্থাকে দেশকালাতীত অবস্থা বলা যাইতে পারে এই দেশকালাতীত অবস্থা হইতে জীব আসে দেশকালের রাজ্যে রস আস্বাদনের জন্য। সদ্য প্রসূত শিশুর কি দেশ বা কাল-জ্ঞান আছে? ক্রমবিবর্তনের পথে ও কাল আসে, ব্যবধান আসে, ভেদবুদ্ধি আসে, দ্বৈতবোধ আসে প্রাকৃতিক বন্ধনেও আগে অদ্বৈত, পরে দ্বৈত সাধনারও আগে অদ্বৈত, পরে দ্বৈত ইহাই শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের 'প্রকৃত অদ্বৈত'। শঙ্কর অকৃত বা অপ্রাকৃত অদ্বৈতের কথা শুনাইয়াছেন রেণু ৮৮, চার বাসুইআটি গিয়া ঘরের বাবদ ভূপতি বাবুর কাছে টাকা দিয়া আসিবার জন্য যায়, ফেরে ২ টায় কোঠাঘর অনেকখানি হইয়াছে বারান্দার পোলিং হইয়াছে। জিতেনবাবু অনুকূলবাবু প্রভৃতি খুব আগ্রহের সঙ্গে আশ্রমের কাজ করিতেছেন। রাজেন আসিয়াছিল, বাসুইআটি যাইবার সম্বন্ধে কথা হয় সে যাইতে প্রস্তুত সাতটার গাড়ী আসে দুপুরে যাইবে। নী আসে ১০টার পর, খায় ৩টার পর গ্রামোফোন সঙ্গীত শুনায়। উষাঙ্গিনী ১০ টার পর চাঁদপাতাল হইতে আসে

মনু ও বড় বৌ আসিয়াছিল ১২শে ফেব্রুয়ারী

সারা জীবন তপস্যার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আজও চলিতেছি খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, বেশ-ভূষা কিছুতেই তো কোন রাজসিকতা ছিল না ১৯০৬ হইতে তেল মাখি জীবনে ২টা মাত্র কোট গায়ে দিয়াছি, স্কুলে মাষ্টারী করিতাম—জুতা জামা গায়ে দিতাম না। যখন পরিদর্শক আসিতেন, তখন জামাজুতা পরিতাম শীত সহ্য করিতে পারিতাম। সম্প্রতি কি তপস্যাই না চলিতেছে প্রাণ চালিয়া মানুষকে ভাল বাসিয়াছি কত মানুষ স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুকে কি তাপই না সৃষ্টি করিতে পারিত, সেই তাপও পরিপাক করিয়াছি। মহাপ্রভুর সঙ্গে একত্র পথে বাহির হইয়াছিলাম, আজ তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে উহা সহ্য করা কি কম তপস্যা! কোনও নির্দিষ্ট স্থানে থাকা, নির্দিষ্ট মানুষ লইয়া থাকা, নির্দিষ্ট খাওয়া পরা তো আমার ছিল না আজও নাই যে কোন স্থানে, যে-কোনও আবেষ্টনে, যে-কোন মানুষের সঙ্গে পথে কাটানো কি যে সে তপস্যা! পায়ে হাঁটিয়া, নৌকায়, ষ্টীমারে, ট্রেনে, মেদিনীপুরের চষা ক্ষেতে দিন-রাত্রিতে বর্ষায় শীতে যে শত শত মাইল ঘুরিয়াছি

তাহাই কি কম তপস্যা! সারা জীবন ছিলাম 'অনিকেত' কুটিরে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া মাদুরে, পালানে, পথে ঘাটে, বৃন্দাবনের রাস্তায় শুইয়াও তো আরামে ঘুমাইয়াছি আরামে থাকিবা আরাম আমি করি নাই আমার আরাম ছিল পথ চলায় এ সংসারের বেশী কিছু ভোগ করি নাই সংসার, অনেকজন, কিন্তু, আপন জন সবই যে আমার পরকীয়। মায়া তো সম্পর্কগত। যাহা একত্বে সম্বন্ধে মায়া, তাহাই অন্য প্রকারে যোগমায়া মুক্তির সম্পর্ক। মায়া relation -এর রকম মাত্র আত্ম- জ্ঞান বিশ্বের one single system হইলেই উহা হয় যোগমায়া বিশ্বের সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক— ইহাই আমার বন্ধনহীন গ্রন্থি সন্তোষ শাস্ত্রী দুপুরে প্রসাদ পায় বেণু চাঁদর বাহির হইয়া ঠাকুরের কটো বাঁধাইতে দেয় ও সুরেশ দাদের ওপানে আসন বানানো ঠিক করিয়া আসে, পত্রাকার জন্য খদ্দর কিনিয়া আনে, সেবানন্দকে খবর দিয়া আসে সে আসে, তাহাকে বারুইআটি যাইবার কথা বলি সত্যব্রত আসে মতুর চিঠি আসিয়াছে, সে বুধবার রওনা হইয়া বৃহস্পতিবার পৌঁছিবে ১০শে ফেব্রুয়ারী

সন্তোষ শাস্ত্রী গত পরশু বলে যে আপনি কলিকাতার প্রচার বন্ধ করিয়া শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিজের তহবিল হইতে এত টাকা খরচ করিলেন কেন? আমার কি ইহা করা ছাড়া উপায় ছিল? আমার উপর এই কার্যের ভার। আমি তো ভাগের মায়ের সেবা বুঝি না ঠাকুরের স্থান হইতে ঠাকুরের সেবা হইলে সব দিক দিয়াই শোভন হয়। আমিও তাহাই প্রাণপণ করিয়াছি ধন সংগ্রহ করিয়া, আমার জনদের খাটাইয়া কাজ সমাধার চেষ্টা করিয়াছি। মনু প্রতিমাসে ৫৲ টাকা করিয়া প্রায় ২ বৎসর, যমুনা মোট প্রায় ৬০৲ টাকা, বেণু তাহার জানদার নিকট হইতে ১০০৲ টাকা, অপরদের কাছ হইতে বেণু কত আদায় করিয়াছে। শরীর দিয়াও প্রচুর খাটিয়াছে আমার যাহারা তাহারা মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একত্র হইয়া সেবা করিতে পারিলে সুখী হইতাম। শ্রীনিত্যগোপাল-ব্রহ্ম-বিদ্যাপীঠ মঠেই স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, হয় নাই। মঠে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন আমিই করিয়াছি। গ্রন্থাগারও এতদিন হইত। জগন্নাথ নিত্যগোপালকে ইহারা চান না। ইহারা চান একটা সাম্প্রদায়িক, বিশেষ একটী ঠাকুর আমি নিত্যগোপালকে বিশ্বের ঠাকুর দেখিতে চাই। আমার নিত্যগোপাল ইহাদের নিত্যগোপাল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন কাজেই সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য ইহারা আমাকে চান না। ইহাদের হইবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি মঠ আমার প্রিয়তম স্থান, ঠাকুরের দেহ ওখানে আছে কিন্তু জোর তো করিব না যদি বাঙলা বিক্রয় করিতে পারি তবে যাইব। তখন হয়ত ঠাকুরের দেওয়া স্বপ্নের স্বপ্ন সফল হইবে – 'ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন শরৎ মনোহর পুকুরে এসে থাকুক'। বেণু প্রেসের খোঁজে শ্যামবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের এজেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করে। একটা প্রেসে গিয়াছিল, পরশু আবার যাইবে। ঠাকুরের কটো

বাঁধানো ও আসনের অটার
বৈকালে সতোন মাষ্টি আসে [illegible] যখন
কথা বলি তখন সকল [illegible] দিয়া কথা বলি,
আমি কথাময় হইয়া যাই মানুষকে বুঝাইবার
জন্য দৃষ্টিই যথেষ্ট নয় কথনও কথনও
[illegible] স্পর্শদ্বারা, চোখের জলদ্বারা, প্রাণের
[illegible] হোলাকুলিদ্বারা, ভাবদ্বারা বুঝাইতে
হয়। প্রতিটী ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে বুঝাইবার
সম্ভাবনা আছে, তিনিই বুঝাইতে পারেন সকল
[illegible] দিয়া। বুঝায় ইহাকে ঈশ্বরপ্রেম ঈশ্বরপ্রেম-
প্রেম—সর্বেন্দ্রিয়দ্বারে প্রেম। ১২ই ফেব্রুয়ারী

নারী তাহার স্বামীর অস্তিত্বকে খণ্ডিত করিয়া,
বিশ্লেষণ করিয়া বহু পুরুষত্বকেও জন্ম দান করে
প্রসব করে। তাই সে বহু-প্রসবিনী মায়া-প্রকৃতি
আর পুরুষ স্বামী তাহার অখণ্ডত্বদ্বারা সেই
বহুকে, সকলকে দ্বিতীয় বারে অখণ্ড রূপে
গড়িয়া তুলিতে চাহেন এই হিসাবে প্রকৃতি
ও পুরুষের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী পরস্পর-বিরুদ্ধ।
কিন্তু জীবনের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে এই দুই-ই
এক হইয়া যায়। প্রকৃতির দৃষ্টি বহুর দিকে,
পুরুষের দৃষ্টি একের দিকে; অথচ ইহারা দুইজন
এক অখণ্ডের দুই দিক মাত্র নারী-প্রকৃতি
ও পুরুষের মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে,
তখনই সংসারে মিলন কিন্তু পুরুষোত্তম তাহার
মধ্যে যখন এই দুই দুই থাকিয়াও এক হন,
দুই-ই দুইয়ের পরিপূরক হইয়াও কেবল থাকেন,
তখনই সৃষ্টি সার্থক যোগমায়ার দেখা। তখন
প্রকৃতির প্রতিটি অংশ ব্রহ্মময়, স্বয়ংপূর্ণ, এবং
এই স্বয়ংপূর্ণ ব্রহ্মময় অংশগুলির হাত ধরাধরির
ভিতর দিয়া সঙ্ঘ রচনা, পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র
করিয়া বাহিরের আবার সমস্ত শক্তির
দিকে গতি 'We are to pass from
the whole to the whole' একটি
primitive অখণ্ড, দ্বিতীয়টী created অখণ্ড
ইহার একটি তীব্র রাসায়নিক আকর্ষণ চলিয়াছে।
নারী ইঙ্গিত করে স্বামীকে স্বামী ইঙ্গিত করে
নারীকে প্রকৃতির কৌশলে সংসারের ওপারে
নিয়া যাইবার পুরুষের কৌশলে এই
ওপারে চলিয়া আসা মানুষকে আবার ওপারে
প্রকৃতির মধ্যে আনা! বহু যদি একান্ত বহু
থাকিতে চায় বহু থাকিবে না, বহু মিথ্যাই
হইবে এক যখন বহু থাকিয়া এক, তখনই
বহু সত্য। প্রকৃতি পুরুষ হইয়াই পরা
প্রকৃতি শ্রীনিতাগোপাল আয়ুক্ত হইল রেণু
জ্ঞানবাবুর সঙ্গে নার্সিং হোমে দেখা করে,
চটায় পি, এম, ডি আসন হইয়া ঠাকুরের
বাঁধানো ফটো নিয়া আসে সতোন মাষ্টি
আসে, রেণুর হাত দেখে দীর্ঘদিন বাঁচিবে,
তাহাতে কোন দ্বিধা আছিবে না বৎসরে
কয়ের আরম্ভ হইবে সাংঘাতিকভাবে যাইবার
জন্য দুর্গাবাবু ভাল দেখিতে বলেন
ছয়োগের বুক চিরিয়া ৬, তাহার
ভাল দিন শ্রীনিতাগোপাল সকল দুর্যোগকে
দুর্যোগ রাখিয়া যদি সুযোগে গড়িয়া তুলিতে
পারেন, তিনিই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তিনি
আমার সহায় কাল কালান্তরে সম্বন্ধ তো
তিনি। দুর্যোগেরই অপরার্ধ সুযোগ আমার কি
আর সকলের মত সুযোগ আছে? ১৩ই
ফেব্রুয়ারী

শ্রীনিতাগোপাল চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়ের

বলা বলিয়াছেন। ইহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ইহা-দের Hegel (হেগেল) ও Marx (মার্ক্স)-এর, অন্বয় ও চাপের সমন্বয় সাধিত হইতেছে। চেতন হইতে অচেতন সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন হেগেল ও অন্বয়, পক্ষান্তরে মার্ক্স ও চাপের প্রেরণা অচেতন হইতে চেতনের সৃষ্টির কথা কিন্তু কেমন করিয়া চেতন অচেতন বা অচেতন চেতন হয়, তাহা ইঁহারা বলিতে পারেন না। অচেতন ভূমিকা হইতে চেতনের উদ্ভব হয় আবার চেতন হইতে অচেতনের সৃষ্টি হইতেছে জীবনের মধ্যে এই পারস্পরিক তওয়ার মিল হয় চেতনের evolution-এ অচেতন, অচেতনের evolution-এ চেতন—ইহাই তো সৃষ্টি অরবিন্দও চৈতন্যের উপর জোর দেন কিন্তু তাঁহার দর্শনে অচৈতন্যের দিবা রূপান্তর কি করিয়া সম্ভব হইবে? অহংকার চেতন না অচেতন? 'নিতাগোপাল তাই অহংকারকেও 'নিত্য' বলিয়াছেন। অহংকার তো চৈতন্য চৈতন্য সমন্বিত। জীবন যাহাদের ছাই, তাহারা চেতন হইতে অচেতন বা অচেতন হইতে চেতনে যাতায়াত করিতে পারেন। জীবনের এক অভিব্যক্তি ঐ অচেতন হইতে চেতনের বা চেতন হইতে অচেতনের সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। চেতন অচেতন সৃষ্টি করে, অচেতনও চেতন সৃষ্টি করে—ইহাই পুরুষোত্তম সৃষ্টি ইহা স্বভাবসিদ্ধভাবেই অনির্বচনীয় বাহির হইতে কোনও অনির্বচনীয়তার আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। মিনু চিঠি দিয়াছে ১৫ই জানুয়ারী রওনা হইবে। রেণু ৯ টায় শ্যামবাজারে প্রেসের খোঁজে যায়, প্রিমিয়ার ও বাস্ত হইয়া ১ টায় ফেরে ৩ টায় জ্ঞানবাবুর ওখানে যায়। সন্ধ্যায় অক্ষয়ের ভট্টাচার্য ও নারায়ণ সান্যাল মন্ত্রী অশোক নমোভাগে কি করিয়া মুক্তি হয়—ইহা শুনে শ্রীরঙ্গ জীবের সাধনা করেন—এই পটভূমিকায়ই নমো-ভাগে মুক্তি হয়। 'তুমি সূত্র খোঁজেন, ছুঁতা খোঁজেন কোন ফাঁকে আমাকে গ্রাস করিবেন। 'অহেতুক মূল্য পাইলে হয়তো বেঁচে'—ভগবানের এই মনোবৃত্তিতে আমার নাম মাত্র সাধনায়ও তাঁহাকে পাইয়াছি অহম্-কেন্দ্রিক সাধনায় ইহা হয় না। শুভ-শুভতর-শুভতম তত্ত্বের আলোচনা হয়। ইহারা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় পুরুষোত্তমবাদ' আলোচনা শুনিতে গিয়াছিলেন। সেদিন প্রতিভা যমুনাও গিয়াছিল। কি বলা হইল জিজ্ঞাসা করি। দুপুরে ১১ টায় উল্লুলেখা আসে দই, অমৃতী, চমচম, সন্দেশ ও কমলা লইয়া। আমার বাড়ীঘাটি যাওয়ার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলে। কেন এই প্রাণটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে? তাহার প্রাণের মধ্যে কোথায় আমার জন্য একটু স্থান রাখিয়াছে। আমারও তাহার জন্য দুঃখ লাগে। ঠাকুর কল্যাণ করুন। ১৩শে ফেব্রুয়ারী

আমার জীবন আকস্মিকের ধাক্কায়, ধাক্কায়, 'breaks'-এর মধ্য দিয়া চলিয়াছে, অথচ 'makes for continuity'। 'Every development is by breaks, and yet makes for continuity'. ১৯০৭-এর পর হইতে কাপড়ের দোকান, বৃন্দাবন যাত্রা, বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা কিছুদিন থাকার পর কাঁকরঝা থাকা,

মোহন বিদায় নেয় লিলুয়া। ৮ বৎসর করার পর ১৯ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী আসা, মিত্তাইবাবুর প্রবণায় বরিশালে ৪৫ বৎসর পরিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখা, পরে উহা লইয়া আবার কলিকাতা আসা, ইন্সোস্কিক্যাল সোসাইটীতে ১৪ রবিবার বক্তৃতার পর কাঁসি প্রভৃতি স্থানে প্রচার, পরে বরিশালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান, সহস্র সহস্র মাইল প্রচার, তাহার পর দেশবন্ধু-চালিত বরিশালে সতীন সেনের সেক্রেটারীতে কংগ্রেসের বাড়ীতে আসিয়া স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ—পরে সেই গৃহেই আনন্দমঠ স্থাপন, কলিকাতায় গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম স্থাপন, পরে আবার ২৪ বৎসরের জন্য বৃন্দাবন বাস, গুজরাট হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন ও লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে উষাঙ্গিনী ও ২৪ জন সহ নলাচড়া পর্যন্ত গিয়া গ্রেপ্তার হওয়া, পরে আবার কলিকাতা আসা, নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন। শ্রীপুস্তকসহ ১৮৯/১ এ খালগর রোডা, উহার পর পুস্তকগণ লইয়া দাঁচারোলে প্রতিভা বেণুসহ নবনারায়ণ আশ্রম চালানো ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশন। আবার বাড়ীঘাটি যাইতেছি আর এত দূরত্বের মধ্য দিয়া চলিব? সতীন সেন যখন গতকাল আমার হাত দেখিয়াছিল বলিল শনি তুলাস্থিতিস্থায়ী চতুর্থের রাজা করিয়া দিয়া যাইতে পারে প্রতি গ্রহই অবস্থাভেদে উৎকৃষ্ট ফল দিতে পারে সব গ্রহই তো সমান। শিব ব্রহ্মরন্ধ্রের জটিলতা তো তাঁহারই বক্রপথের ভোগক। আমার জীবন তো straight line এ চলে নাই। শনি রাহু আমার গুরু, বন্ধু, প্রিয়। ঠাকুরের কাছে কি চাহিয়াছিলাম, আর কি পাইয়াছি ভাবিলে বিস্ময় হয়। আমি নূতন দর্শন পাইয়াছি। জটিলতার পথে আসিয়া কি আমার লোকসান হইয়াছে? আমাকে তো ঠাকুর রাজাই করিয়াছেন ১৯শে ফেব্রু:

ঠাকুরের নিকট হইতে কুমার নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গীতার কথা শুনিয়া আমার মায়ের জন্য একখানি কিনিয়া লই ও মাকে দেই। রোজ পড়িতেন। মা আমাকে ভালবাসিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে খুড়ী জেঠীমাদের বলিতেন, 'তোমরা যাইও, ছোট বসিয়া তোমাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। অনেক ভাল কথা জানে, শুনিবে'। আমার দীক্ষার কথা মা জানিতেন। মাকে যে গীতাখানি দিয়াছিলাম, উহাই ছিল মুক্তকেশী লাইব্রেরীর যাহা দাদা করিয়াছিলেন। এক নম্বরের বই, মায়ের হাতের বই, পড়া বই মা থাকিতেই আমার বিবাহ হয়, সন্তানও জন্মে। মা ছিলেন নিতান্ত নিরীহ, মুখ বুঁজিয়া সব সহ্য করিবার মত মানুষ। সঙ্কীর্ণতা তাঁহার দেখি নাই। মা লুকাইয়া লুকাইয়া নীলষষ্ঠীর সেবা করিতেন। আপন পর ভেদবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। মাকে সকলে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। আমাদের ঘরে ছিল গ্রামের সব যুবকদের খেলিবার গানবাদ্যের চক্র মিলনের স্থান। মনে আছে, প্রকাণ্ড খোলাগুলা মৃদঙ্গচাঁটাকাঠের চারদিকে বসিয়া সকলে খাইতেছে। মা-ই এই সবের বন্দোবস্ত করিতেন। মা চিরকাল পেটরোগা ছিলেন। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর। মেজে জেঠীমা মা-কে সুনজরে দেখিতেন না

সন্তানের দুধ খাওয়া নিয়াও কথা হইত। মা ছংবোধ করিতেন। একাগ্রচিত্ততার দিকে চাহিয়া বাবা চুপ ক'রয়া যাইতেন মার একতরফা সহিতে হইত মা, মা, মুক্তকেশী, আমায় কোলে কর। রেণু ৮ টার পর জ্ঞানের বুর ওখানে যায়। সুব্রত সকালে আসে। নীলু কাল আসিবে না। তাহার লিভারের বেদনা বাড়িয়াছে। ...২৩শে কেব্রু:

মা সকলে বিনয় নিরহঙ্কার স্বভাবের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন কুসিকম খুব ভালবাসিতেন। পশ্চিমের ভিটির ঘরের (যেখানে মা থাকিতেন) দক্ষিণে নিজের হাতে ছোট একটা ক্ষেত রচনা করিয়াছিলেন। আমার খাবার কালে মা কাছে না বসিলে আমার পেট ভরিত না। আমার বাবার দুই বিবাহ। মা দ্বিতীয় বারের। প্রথম বারে বাবা মায়ের বড় ভগিনীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ৫ ভাই ২ বোন— অনুপমা, প্রসন্নকুমার, মনোরমা, শরৎ-কুমার, নিরুপমা। মা পাকা গৃহিণী ছিলেন কার্তিক পূজার ৭ দিন পূর্বে দেহত্যাগ করেন। বাবার শোবার খাটের নীচে দেখা গেল নবাবের জন্য মানকচু ইত্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন। খাটুনীর বিরাম ছিল না। অথচ গৃহিণী রোগ ছিল চাকর বাকরেরা কত ভালবাসিত। 'ছোট ঠাকুরাণী' বলিয়া সম্মানের সহিত কত ব্যবহার তাহারা করিত। মনিয়া ভাই' বলিয়া আমরা ডাকিতাম এমন এক নম:শূদ্র চাকর ছিল। সে দীর্ঘদিন আমাদের সংসারের বাহিরের চাকর ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার শ্রাদ্ধের দিনের কথা পরে বলিব। তাহাকে খুব ভালবাসিতাম। উমেশ সুর বলিয়া গ্রামে এক বালাবন্ধু ছিল। রাজেন আসে সকালে, দুপুরে প্রসাদ পায়, সভার শেষে যায়। 'রাজেন নিবেদিতা' পড়ে, কথা হয়। ঠিক ৫ টায় পাঠ আরম্ভ হয়। ভক্তিযোগ-দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির সুবিধা হইয়া থাকে ও শীঘ্র হয়—ইহার ব্যাখ্যা হয় ভক্তিবাদে ভগবান ভক্তের প্রতীক্ষায় থাকেন— ইহা বিশ্বাস হইলে সব সহজ হয়। দাতা-গ্রহীতার পাট্টা কবুলিতেদ্বারা সাধনা জটিলতর হয় মাত্র। ভগবান ভক্ত সম্বন্ধ স্বার্থ। 'তদেজতি তন্নৈজতি' মন্ত্র আরম্ভ করা হয় মরীচিকার ব্যাখ্যায় আমে, মরুভূমির বালি ও সূর্য কিরণের মধ্য দিয়া আমাদের সম্পর্ক বিবেচনা করিলে যথার্থ ঘটনা ধরা পড়ে। নর, নারী ও বিশ্বের আবেষ্টনে পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করিলে কামুকতা থাকে না। Light-এর refraction reflection প্রভৃতি ব্যাপার শঙ্করের মরীচিকায় জল ভ্রমের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যার মধ্যে বাদ পড়িয়াছে। সর্প, রজ্জু ও সন্ধ্যার dim light তিনটির বিচার করিলে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের অর্থ বাহির হইবে। অশ্বিনীকুমার শতবার্ষিকের সহ সম্পাদক যতীন ঘোষ আসে বিমলা, জগদীশবাবু, অনন্ত, গজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি আসে। ইন্দেন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে নূতন একজন আসেন। Nat phos 200x খাই। ১৬শে ফেব্রু:

আমি সারাজীবন 'কুনো' অর্থাৎ ঘরে থাকারই স্বভাবযুক্ত ছিলাম, ঠাকুরের স্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত বলা চলে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িতাম—স্কুল আর বাসা। বরিশালের মনোরম

নদীর পারের মত স্থানে বহুদিন যাইতাম। সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা করিতাম। মাঝে মাঝে কীর্তনে যাইতাম। ছোট কাল হইতেই ঝোঁক ভজন ছিল। বরিশালে প্রথমে ৺ দুর্গাচরণ গুহ-ঠাকুরতা মহাশয়ের বাসায় ও বিহারীলাল ঘোষের সঙ্গে থাকিতাম। সেখানে একটা টিকাবোর্ড (mess) মত ছিল। মহিমচন্দ্র দাস ছিল তাহার মালিক। ৫ টাকার কম দিতে হইত। মহিম আমার সেবা করিত। আমি ছিলাম পেটরোগা; কোন কোন দিন বাজের বেগ সামলাইতে পারিতাম না। মহিম কাপড় ধুইয়া দিত স্কুলের পর আমার জন্য রাঁধা ভাল-ভাত খাইতাম ক্লাস VI এ বরিশালে ভর্তি হই। উমেশ-চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়। সহপাঠী ছিলেন। তাহার সঙ্গে 'little brothers of the poor'-এ যোগ দিয়া কিছু দিন কলেরা রোগীর সেবা করি। খুব বেশী নয় ছেলে পড়ানোনায় মন্দ ছিলাম না। সংসার ও সংসারের কাজকর্ম যে মিথ্যা, পড়াশুনাও যে সংসারের কর্ম এ ধারণা ছিল। কাঁকুরগাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। বোধ হয় নাম 'তত্ত্বমঞ্জরী'। তাহাদের সঙ্গে চিঠিপত্রাদি লিখিতাম। সেই সময় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়ি ও তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিতে থাকি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ভাল লাগিত মেয়েদের মুখের দিকে তাকাইতাম না। পথে চলিতে মুখ নীচু করিয়া চলিতাম। মেয়ে দেখিলে চক্ষু বুজিতাম। ...সন্ধ্যার পর বীরেন মহারাজ আসেন। যতদূর মনে হয় সেবানন্দ মহারাজও যাইবে না। উন্মাদিনীর চক্ষুর যে অবস্থা তাহাতে তাহাকে লইয়া শিবরাত্রির দিন যাওয়া সঙ্গত হইবে না। তাহাকে বাদ দিয়া যাওয়াও ভাল লাগে না, উচিতও নয় সন্ধ্যার পর বেরুনো আসে।

১৭ই ফেব্রুঃ

যাহারা সংসারের বাহিরে ভগবানকে চান প্রচলিত সাধন ধারার অনুসরণ করিয়া, তাহাদিগকে সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া যাবতীয় সংবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া একান্ত ঊর্দ্ধগতিতে অন্তর্মুখী গতিতে চলিতেই হইবে ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া বিষয়ে বিষয় ছাড়িয়া মনে, মন ছাড়িয়া বুদ্ধিতে, বুদ্ধি ছাড়িয়া মহত্তত্ত্বে, মহৎ ছাড়িয়া অব্যক্তে, অব্যক্ত ছাড়িয়া পরপুরুষে হইতে হইবে। মন বুদ্ধি ছাড়ার অর্থ তো Either-or-কে ছাড়া, dialectic-কে ছাড়া। Either-or যদি ছাড়িতে হয়, তবে তো অন্তর্মুখী বহির্মুখীও ছাড়িতে হয়। কেননা উহাও মন-বুদ্ধির ক্ষেত্র। এই ছাড়া কি শূন্যের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া নয়? একান্ত শূন্য তো নাই। ফলে দাঁড়ায় যে কোনও একটা ধারাকে আশ্রয় করা হইবে ছাড়ার ছলে। অদ্বৈতবাদিগণ মনবুদ্ধি ছাড়িতে গিয়া মন বুদ্ধিরই এক শাখা অন্তর্মুখী গতিকে আশ্রয় করিল। ইহার ফলে অপর শাখা ঐ বহির্মুখী গতির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হইল মন-বুদ্ধিরই অন্তরে। মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মন' নিজের মধ্যে যেন মুষড়িয়া গেল। ইহা 'প্রকৃতি লয়'। এই প্রতিপক্ষ সাধনায় ব্রহ্মলয়ের স্থানে মনের লাভ হইল প্রকৃতি লয় সত্যিকার মনবুদ্ধি লয় হয় মনের ঠাকুর, মনের মানুষের টানে তাহার কাছে মন বুদ্ধির আত্ম-নিবেদনে। তখনই মনের দুই ধারার মধ্যে আসে সমন্বয়। তখন ভগবান আসেন মন বুদ্ধির সকল

ভাস্তুর মাঝে ইহাই স্বাভাবিকী বৃত্তি তখনই সৃষ্টিচয় পুরুষোত্তম-সৃষ্টি৮ রেণু ৭ টার পূর্বে যাওয়াআসি যায় জিতেনবাবুর কাছে কৃপতি-বাবুর সামনে টাকা দিয়া আসে। ফিরে এসেই পর মিনু আসিল না। ...১৮শে ফেব্রুঃ

কাল মিনুর আসবার কথা ছিল। রেণু বলিল, 'মিনু ডাকবাংলো'। মাকে কেউ ডুবাইতে ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ভয় কি? টেনে তুলব' বাবলালের চক্রপাণি কবিরাজ ছোট মিশি কবিরাজ, আমার সম্বন্ধে বলিতেন, 'যারে আল্লায় রাখে কেলকা মইরা, তার ঠাঁয় টাইনা করব কি?' নিজে ঈশ্বরের আছে ফক-সহায়। আমার কিছু নাই নিতাগোপাল কৃপা-ছড়া। ধন নাই জন নাই, আবেষ্টন নাই যাহার উপর নির্ভর করিতে পারি মানুষ আসে যায়। কি আছে আমার তিনি ছাড়া? কোনও কিছু বিশেষের উপর বিশ্বাস করিবা যো নাই। সব-কিছুর অভাবই আমাকে সব কিছুর সদ্ভাবের দিকে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে কত বাঁকে ঘুরিলাম আমার জীবন আকস্মিকের ধাক্কায় সরিয়াছে আকস্মিক ভাবে মানসরে নবনারায়ণ আশ্রম, আকস্মিক ভাবে এই বাড়ীতে আসি, আকস্মিক বলদবাদ, আকস্মিক ভাবে রাহের কাজ, আকস্মিক ভাবে পুত্র কন্যা-দের সরিয়া চাঁচানো ও প্রতিভা-রেণুর আগমন, আকস্মিক ভাবে উজ্জয়ন্তীরত্তে প্রভা গোপার আসা, টাকিগাছে নবনারায়ণ আশ্রম লইয়া যাওয়া আবার এখানে আসা, আকস্মিক ভাবে নীহারবাবুর বাড়ীআটিতে জায়গা করিয়া দেওয়া, কুমারের আসা, আকস্মিক ভাবে কৃপতিবাবু জিতেনবাবু অনুকূলবাবুর দ্বারা বর্তমানে ঘর করিয়া দেওয়া। তিনি আছেন 'এক' সহায় সকল ঘটনার মধ্য দিয়া। তিনি জয়যুক্ত হউন।

সাময়িকী

সমস্যার সমাধান :—

আজ বিশ্বে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হল সামগ্রিক কল্যাণ বোধের অভাব, ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠি এবং রাষ্ট্র পঞ্চাশ বৎসর আগে থেকে আজ খানিকটা বেশী বোঝে যে অপরকে বাদ দিয়ে আমি বাঁচি না। যতটুকু বেশী বোঝে তাতে এখন পর্যন্ত যে ফলটা পাওয়া গেছে সেটা বলিয়েকেই মুখ্যতঃ মানুষের স্বভাবে যে অপরকে—জাতি বর্ণ দেশ নির্বিশেষে—স্বাতন্ত্র্য দেবার, মর্যাদা দেবার মানসিকতা সহজ হয়েছে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। এখনও মানুষ অপরকে যে স্বীকার করে সেটা চাপে পড়ে, উপায়ান্তর না থাকলে—আনন্দ দিয়ে, স্বতঃস্ফূর্ত খুশী দিয়ে কয়জন অপরকে মর্যাদা দেয়?

এখনও সেই পুরনো দিনের চিন্তাধারাই মানুষের মধ্যে কাজ করছে আমি, আমার পরিবার, আমার দল বা আমার দেশই প্রধান—অপরকে তার অনুগামী হয়ে থাকতে হবে। সমস্ত সমস্যাটা এই খানেই। ব্যক্তি দল বা দেশ যেমন স্বাতন্ত্র্য চায় মর্যাদা চায়, কর্তৃত্ব চায়, তেমন যদি অপরের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা কর্তৃত্ব সরল ভাবে সহজে মেনে নিতে পারে এবং যে সেই কর্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্য পাচ্ছে না তাকে সেটা দিতে পারে কিংবা ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু সমস্যা এত জটিল হয় না।

এই অপরকে মর্যাদা দিতে চলে শিশু বয়স থেকে সেটা শেখাতে হবে। শিশু নিজের অস্তিত্বকে সব দিক থেকে নিরাপদ করতে চায় এটা তার জৈবিক স্বভাব এবং সেজন্যই এটা অস্বাভাবিক নয়, অসুস্থতাও নয়। কিন্তু এই নিজকে নিরাপদ করতে চেয়ে সে যখন অপরকে অস্বীকার করতে চায় সেইটা সুস্থতা নয়, সেটাকে সুস্থ জৈবিক স্বভাবও বলব না। কেননা বিশ্ব-ব্যবস্থা এমন-ই যে এখানে সকলেই 'আছে' সকলকেই 'থাকতে' হবে তাকেই বিশ্ব-বিধানে কারো অস্বীকৃতির নয় এখানে 'অন্যোন্যেন মধুজ্ঞানে পরস্পর প্রকাশিতম্'। পারস্পরিক মধুজ্ঞানই বিধানের ব্যবস্থা। আমরা পারস্পরিক মধুজ্ঞানের মানসিকতা গ্রহণ করি নি। এখানে ব্যক্তি দল বা দেশ একজন আর একজনকে প্রতিহত (contradict) করবে এইটেই সত্য বলে বুঝেছি কিন্তু একজন আর একজনকে যে পরিপূরণ (complement) করেও চলেছে এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করি নি। বিশ্ব এই প্রতিহত ও পরিপূরণের হাত ধরাধরির দিয়ে চলেছে। এই পরিপূরণের কথাটা বিস্মৃত হই বলেই সামগ্রিকতার বোধ আমাদের আসে না, তাই সামগ্রিক কল্যাণ-বোধ বলেও আমাদের কিছু জাগ্রত হয় নি। তাই বিশ্ব জুড়ে একই মনুষ্য জাতি—এ কথা আমরা জানি না; আমরা বিশ্বের দল গোষ্ঠী বা দেশ বুঝি, আমরা অপরকে শুধু প্রতিহত বা অভিভব করে বাঁচবার কথা জানি, পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলে বেড়ে উঠব এমন কথা আমরা শিখিনি। অথচ আমাদের ভাগবত উপনিষদ এই পারস্পরিকতার কথা, সহযোগিতার কথায় ভরপুর—ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বি নাবধীতমস্তু...মা বিদ্বিষাবহৈ...। এই পারস্পরিকতা ও সহযোগিতা নিজের দলের মধ্যেই বা নিজের দল নিয়ে নিজের দেশের মধ্যেই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে পশু তথা জীবজন্তুর স্তর থেকে তো তা আর মানুষত্বের স্তরে উঠল না। তাই আজ শিশুদের মধ্যে তোকাতে হবে এই দল-চেতনা নয়—সামগ্রিকতার চেতনা- যেখানে দল দেশ নির্বিশেষে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, কাল নির্বিশেষে সবাই একই মানব গোষ্ঠী—সকলের হাত ধরাধরিতে মহারাসমণ্ডল রচিত করার প্রয়াসই মানব জীবন।

এর পরেই আসবে সত্য বা সততার কথা —আজিকার বুদ্ধিমান মানুষ অনেক কিছুরই অধিকারী হয়েছে কিন্তু সে যে নিজের ভিতরে বাহিরে সত্য বা সততাকে হারিয়ে ফেলেছে এর পেছনেতে সে যে কি ভাবে দিচ্ছে তা কি সে বুঝছে? আজ মানুষের ভাণ্ডারে এত জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পদ

অথচ সে সম্পদ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে না—দল বা দেশের নামের আড়ালে তা ব্যক্তিগত ভোগেই লাগছে। অর্থাৎ মানুষ মুখে বলছে এক রকম, আর তার অন্তরের মানসিকতা অন্য রকম। প্রত্যেকেই অন্তরে বলছে আমার আরও চাই এবং সেই ভাবে চেষ্টাও চালাচ্ছে অথচ মুখে বলছে তোমার জন্যই আমি আছি। 'আরও চাই' প্রত্যেকের এই চাহিদা মেটাতে সাধারণকে বঞ্চিত করতে হবেই। প্রত্যেকেই যে আরও চায়, সে কি খোঁজ নিয়েছে আর সকলে তারই মত পাচ্ছে কি না? বিশ্বে এত সম্পদ নেই যে সকলের আরও চাই-এর দাবী মেটাতে পারে। ভাগ করে খাওয়ার মানসিকতা এবং অন্যে খেল কি না খেল তার খোঁজ না নিয়ে কেবল নিজেরই জীবন যাপনের মান বাড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা থেকে ছোট বেলা থেকেই ছেলে মেয়েদের রক্ষা করতে হবে। আর রক্ষা করতে হবে অসত্য ভাষণ ও অসত্য আচরণের মানসিকতা থেকে। বড় থেকে ছোট কোথায়ও সত্য ভাষণ ও সত্য আচরণের মানসিকতা পাওয়া যায় না আজ—কেবল সুবিধাবাদ। শিক্ষিত বাপ মা শিশুর বয়স প্রয়োজন মত বাড়িয়ে কমিয়ে জীবনের প্রাক্তঃ কালেই তার সামনে মিথ্যাচার ও সুবিধাবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন নিজেরাই করছেন—সেই শিশু পরবর্তীকালে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সত্য গোপন ও মিথ্যার আশ্রয় নেবে - এতে আর আশ্চর্য কি? আজ মানুষকে বাঁচতে হলে ভাষণ ও আচরণের এই অসত্য পথ বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে অপরকে বঞ্চনা করে নিজের সম্পদ বাড়াবার মানসিকতা। কথায় কি চিঁড়ে ভেজে না একথা সত্য কথা আছে বটে, কিন্তু আজকের মানুষ শুধু কথার ফুলঝুড়ি উড়িয়েই কেল্লা ফতে করতে চাইছে। আজকের দিনে সমস্ত দিকে শুধু বাক্যের জন্য জয়কার— সেই বাক্য যার সঙ্গে বাস্তবিকতার সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বিভিন্ন উপনিষদ বিভিন্ন ভাবে দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করেছে যে বাক্য থেকে জীবন অনেক বড়। বাক্য জীবনের জানা অংশই শুধু প্রকাশ করতে পারে, অজানার মর্ম দিয়ে চলতে পারে শুধু প্রাণ। এই প্রাণ বায়োলজিক্যালি জোর্ড, সাইকোলজিক্যালি শ্রেষ্ঠ। বাক্য কিংবা যে কোন অংশ-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে মানুষ যখন প্রাণের উপর তার সত্তাকে স্থাপন করতে পারবে তখনই মাত্র বঞ্চনা করা বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বন্ধ হতে পারে। প্রাণ অপরকে ঠকাতে পারে না। জীবনটা যতক্ষণ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণ প্রত্যেকের যুক্তি আলাদা, প্রত্যেকের যুক্তির সঙ্গে প্রত্যেকের টক্কর লাগে। কিন্তু আমি যদি ভালবাসি, তাহলে তোমাকে বঞ্চনা করতে আমার প্রাণ কেঁদে উঠবেই। তোমাকে না খাইয়ে শুধু নিজে খেতে পেরে উঠব না। এই হৃদয়ের মধ্যে যুক্তির একটা ব্যাপকতর রূপ আছে—আজ সেই যুক্তি দরকার। যে যুক্তি বা বুদ্ধি সমগ্রকে ধারণা করে আরম্ভ করতে পারে না—প্রথম থেকেই নিজেকে একটা পক্ষ করে সেই পক্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রাখে, সেই বুদ্ধি আজ চাই না। যে বুদ্ধি তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থ একই মানদণ্ডে বিচার করতে পারে,

তোমার স্বার্থকে মুক্তিদাতা খণ্ডন করাই, অভিভব করাই যার প্রধান উদ্দেশ্য নয় আজ সেই বুদ্ধি চাই তাহলেই সমাজ, রাষ্ট্র হবে, সোয়াস্তি পাবে, সুস্থ হবে। 'বিশ্ব-সভ্যতা তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করে ধন্য হবে। 'বিশ্বের সমস্যার আর কোন তাত্ত্বিক সমাধান হতে পারে না. বিশ্বে বিভিন্ন পক্ষ, বিপরীত পক্ষ থাকবেই—তাদের একটির দ্বারা অপরটির সম্পূর্ণ উৎসাদন কি সম্ভব? বিজ্ঞান-মতে কোন বস্তুরই সম্পূর্ণ ধ্বংস নেই তারা রূপ পাল্টায় মাত্র। কোন পক্ষ তার বিপরীতের বল-দ্বারা পরাজিত হতে পারে, আত্মগোপন করতে পারে মাত্র, সম্পূর্ণ উৎসাদিত হতে পারে না. আবার সুযোগ বুঝে সে হৃত প্রাধান্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেই। পরস্পরের অভিভবের পথে কেউই মরে যাবে না. এক এক সময়ে একজন প্রাধান্য লাভ করবে মাত্র। [illegible] প্রাধান্য অস্বীকার করে, অপরকে অভিভব করে [illegible] বা দলের আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা-চেষ্টারই নাম শ্রেণী-সংগ্রাম। সে পথে সমস্যা কোনদিন [illegible] সমাধানের পথ পাবে না। 'দ্বন্দ্বপরাধান্যাৎ [illegible] দ্বন্দ্বঃ'—দ্বন্দ্বের প্রাধান্য স্বীকার করে সমস্যার মধ্যে উভয়ে বিদ্ধ হলে বৃহত্তর সমন্বয়ের অবসান হবে। সেইখানে হৃদয় তার সামগ্রিক দৃষ্টি [illegible] নিয়ে নেমে আসবে—সেইখানে সকলের সম্মান মহান স্থান স্বীকৃত। সমাধানও সেই পথে। 'হৃদয় সমন্বয়েরই মহিমা মাধুর্য প্রকাশের স্থান'।

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র—
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে

[illegible] মাটির বাসন ছাড়া অন্য কোন ধাতু দ্রব্য বাসন ব্যবহৃত হয় না। ইহারই জন্যে জগন্নাথের ভোগ ইত্যাদি রান্না হয়। জগন্নাথ জগতের ঠাকুর তাই সাধারণের মতই তাঁহার আচার-বিচার, চাল চলন, অসন-বসন। সব এখানে সহজ প্রাচীর-গাত্রে ঐ সকল কামভাবমূলক ছবির স্থান হইয়াছে। যে সাম বিশ্বকে গড়িয়াছে, দিয়া বিভক্ত করিয়াছে, সেই দিয়া-বিভাগকেই আবার একত্বে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রতি অণু পরমাণুর মাঝে একটা উন্মাদ আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে, সে কাম যে সব সাধারণের, তাহার যে একটি দিব্য ভাগবত রূপ আছে, তাহাই এখানে পরিস্ফুট। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রই বিশ্ব-ভাতৃত্বের কেন্দ্র। ইহার ধূলি গায়ে মাখিয়া আমি ধন্য। এই স্থানের এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই আমার জীবনের ব্রত ...আনন্দ বাজারে যায়।

মন্দিরের চারিদিকেও অসাধ বিক্রয় হইতেছে। অন্য সম্বন্ধে কি বিরাট সাম্যের বাহিতোর আস্বাদন! কোথায়ও এমন 'সহজ' ভাব নাই। এখানের ঠাকুর, ঠাকুরের প্রসাদ যে সব সাধারণের। আজ উহারা বেশ ভাল করিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিয়াছে সাজানো অবস্থায়। সহজের ঠাকুরকে ঘিরিয়া এখানের সব কিছু সহজ। এখানে অন্য ভক্ত যেখানে জীবন ও জীবনের আস্বাদন সহজ, যেখানে ঈশ্বরের কাড়াকাড়ি নাই, সেখানের অন্ন সকলই সহজ প্রসাদ। মন্দিরের গাত্রে নর-নারীর যৌন সঙ্গের যে সব মূর্তি রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া এই কথাটাই বলা হইয়াছে যে সবসাধারণের জীবনের সাড়া-কার এত আকর্ষণ দিয়া, উহারও ভাগবত রস পুরুষোত্তম-বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে এই আকর্ষণকে চরম করিয়াই— এড়াইয়া নয়— প্রতি পুরুষকে পুরুষোত্তম হইতে হইবে। বৃন্দাবনে এই তত্ত্ব পারমার্থিক ভাবে আস্বাদিত হইয়াছে; পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে তাহারই ব্যবহারিক আস্বাদন হইয়া উঠিবে। এই সব মূর্তির প্রয়োজনীয়তা এখানে নিশ্চয়ই আছে। নরনারী কোন্ ছন্দে এই যৌন-আকর্ষণকে পরিপাক করিয়া মনুষ্যোত্তম হইবে তারই সাধনা এখানে রহিয়াছে। বিশ্বরূপ না হইলে মনুষ্যোত্তম হওয়া যায় না। বিশ্বরূপের সাক্ষাৎ ক্ষেত্র এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। তাই এখানে অন্ন বিশ্বরূপ, চালচলন আবেষ্টন সব বিশ্বরূপ।

পুরুষোত্তমের রথযাত্রার অর্থ হইতেছে পুরুষোত্তম-তত্ত্বকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যাত্রা। মাসীর বাড়ী যান অর্থ রক্তমাংসের সম্পর্কযুক্ত সংসারের বুকে যান, সেখানের 'খণ্ডের পিঠা' খাইতে। রথী আত্মার বিষয় ভোগের অন্তরে যে দিব্য ভাগবত প্রেরণা লুকানো রহিয়াছে, তাহাই রথযাত্রার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ....পুরীতে সবতোই অন্যের ব্রহ্মরূপ, মহাপ্রসাদরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যেখানে কাড়াকাড়ি নাই, সকলেই যেখানে সমবেত, যেখানে উচ্চ নীচ সমভাবে মিলিত, সেখানেই ব্রহ্মবস্তু জমিয়া উঠে। পুরী তেমনই একটি ক্ষেত্র সহজ জীবনের আস্বাদন ক্ষেত্র এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। ....শুচি-অশুচি সব-বোধ-তত্ত্ব যদি absolute হইত, তবে কাহারও সঙ্গে কাহারও কিছু থাকিত না। কিন্তু উহারা যে সবই relative, কাজেই জীবনের ক্ষেত্রে সকলকে মান দান করিতে হইবে, না হইলে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে জীবনই বিপন্ন হইবে। ....মায়ার ওষ্ঠের মূল্য, বন্ধুর মূল্য দিয়াছে, ভাইয়ের দেয় নাই, মায়াবাদে আত্মার মূল্য দিয়াছে, অনাত্মার মূল্য দেয় নাই। পুরুষোত্তম একাধারে বড় ছোট, ব্রহ্ম মায়া, আত্মা অনাত্মা, চৈতন্য অচৈতন্য। মহাপ্রভু খোলাবেচা শ্রীধরের মূল্যও যেমন দিয়াছেন, বাসুদেব সার্বভৌমেরও তেমন মূল্য দিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের যেমন ধূলিরও তেমন মূল্য দিয়াছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, ধরাকে বৃন্দাবনে গড়িতে চাহিয়াছেন। ....সরস্বতী পূজার মনে হইতেছিল এমন করিয়া আটকে উচ্চতম জীবনে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কৌশল হিন্দু ছাড়া আর কেহ জানিত না। ব্রহ্মের মূর্তি না থাকিলে কি তাহা সম্ভব হইত? আইডিয়ান ব্রহ্ম শুধু morality দ্বারা উপাস্য। পুরুষোত্তম জীবনেই শুধু আর্ট ও মরালিটি সমন্বিত। এই জীবনের উপরেই ভারত বাপে ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু মূর্তি ও অমূর্ত একের সমন্বিত পুরুষোত্তমই ভারতের ইষ্ট"।

গীতাসাগর মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য বহুস্থানি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। বৃহত্তর আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ আর্টেটনহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সাধারণ সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, আর্টেট সহ ১২·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় ভাষ্যের সম্পদ। "যেমন ভাঁর কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষার শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয় জুড়ে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	মিনি পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	সদানন্দ ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	১·০০		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কথাবাণী	২·০০	Soul of India speaks	৭·০০

সুলেখক শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

বাজারে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার ঋষি	৭·৫০	**ব্যায়ামবীর শ্রীনীহার গুহরায়ের**	
বাংলার বিদুষী	৪·০০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
ব্রাহ্মবি রামমোহন	৪·০০	রোগে দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০	সহজ যোগ ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	ঘোষ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত

ব্যাবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

সর্বদা ব্যবহার প্রয়োজনীয় অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

এ. সি. ঘোষ এণ্ড কোং লিঃ ১৪, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No 57-2540 UJJIVALBHARAT

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ইহাকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সম্বন্ধে আরো নীচের বইগুলিতে।

On earth one family. Truly religious persons are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional speeches —Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে তুচ্ছ ভগবান বসবার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের বই ॥

	॥ মুদ্রিত ॥	
১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	৫·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	১১·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	১০·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	৩·০০
	কেনোপনিষৎ	১·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৫·০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১·০০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	৪·০০
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৪·০০
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯।	শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও দর্শনে	৫·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·২৫
১১।	গীতাজয়ন্তী	০·৬০
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	০·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর [illegible]	
	পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা	৩·০০
	(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা	১১·০০

	॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
১।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩।	৺ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ

14 AUG 1971

	॥ ৬ প্রতিভা বাবুর ॥	
১।	নারী পর্ব্বতির ভূমিকা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য এবং শিষ্যা	
	নিতাগোপাল চক্রবর্তী ও সুধার কথা	৩·৭৯
৩।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

	॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥	
১।	সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিতাগোপাল	১·০০
২।	হরানুরাগের ঘরে বাইরে	১·০০
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন	৫·০০
	ওরিয়েন্ট বুক কোং	
৪।	রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৯·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম: বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, ষ্টেশন—বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৯। ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা ৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o কে লিলাইব্রেরী) হাতিবাড়া হইতে মুদ্রিত।

'আমি বিশ্ব-নাগরিক'

LIBERATED CALCUTTA

এই বিশ্বই আমার স্বরাজ'

কা, ঐ: ১৯৭৮

—বেণু মিত্র

ঘোষণা

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ অনিবার্য কারণে 'উজ্জয়ভারত' পত্রিকাকে মাসিক হইতে দ্বিমাসিকে পরিণত করিয়া ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। উজ্জয়ভারতের পাঠক ও অনুরাগীবৃন্দকে আমরা সানন্দে জানাইতে চাই যে আগামী মাঘ ১৩৮৪-এ উহাকে ৩১-তম বর্ষারম্ভ হইতে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি লইয়া, বিভিন্ন রচনায় সমৃদ্ধ করিয়া আমরা উজ্জয়ভারত পত্রিকাকে পুনরায় মাসিক পত্রিকারূপে নব কলেবরে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। মাসিক মূল্য তখন এক টাকা এবং বার্ষিক বারো টাকা ধার্য হইবে।

—সম্পাদিকা, উজ্জয়ভারত

উজ্জয়ভারত:
প্রতি সংখ্যা ১·০০, শারদীয়া ১·৫০

বিপ্লবী দার্শনিক শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

সূচীপত্র :—উজ্জলভারত

শ্রাবণ-ভাদ্র-শারদীয়া—১৫৮৫

১।	প্রার্থনা—	
	শ্রী নিতাগোপাল	২৪
২।	পূজার দিনের গান	৬৭
৩।	মাতৃ-প্রণাম	
	শ্রীরেণুমিত্র	৬৪
৪।	প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ বিপিন বিহারী সেন	
	ডাঃ শ্রীদীনেন্দ্র চৌধুরী	৬৮
৫।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী—১৯৪৬	৭০
৬।	কৃষ্ণ-প্রণাম	
	শ্রীরেণুমিত্র	৮০
৭।	শিবাজী-স্মরণে	
	শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা	৮৩
৮।	এক একটা দিন আসে	
	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ	৮৪
৯।	আবির রঙে আমার কৌতূহল	
	শ্রীগণেশ চক্রবর্তী	৮৫
১০।	যোগী বরদাচরণ	
	শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ	৮৬
১১।	মা	
	শ্রীসুনীতি সান্যাল	৮৯
১২।	হিংসেশুর আসুক	
	শ্রীঅখিল রায়	৯২

শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয় আকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার সাকার নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয় চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়"।

For mini Bus, Bus, Semi Delux and Delux and All types Lorry body building.

Please contact,

PEEJAY ENGINEERING WORKS.

Structural and Mechanical Engineers and coach Builders.

works
shed no 3 E25 and E26.
Behala Industrial Estate.
Calcutta—700060

OFFICE
22A JORABAGAN ST
CALCUTTA—700006

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উজ্জ্বলভারত

শারদীয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৮

প্রার্থনা — শ্রীবিভাগোপাল,

সদানন্দময়ী শিবে শঙ্কটবারিণী,
স্নেহময়ী আদ্যা শক্তি তুমি যে জননী,
বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী তুমি যে পরমেশ্বরী—
তুমি অপরূপা অনুপমা আহ্লাদিনী,
কলুষনাশিনী কালী ত্রিলোকব্যাপিনী।
তুমি বিশ্বময়ী তারা, তুমি হর মনোহরা
ত্রিতাপহারিণী, বিপদনাশিনী.....
অজ্ঞানবারিণী, কালী ভবদারা
নীরদবরণী, নলিন নয়নী
শিব সীমন্তিনী সন্তপ্ত সারিকা।
পরম শিবানী যোগেশ যোগিনী
ভূতিবিভূষিণী ভীমা ভয়ঙ্করা।
সুধাংশুভালিনী গিরীশমোহিনী
সুচারুহাসিনী চারু চন্দ্রচূড়া
পরমা প্রকৃতি বিভাবতী সতী
জটাবিমণ্ডিত বাঘ্রচর্ম্মধরা
সুখস্বরূপিনী মৃদু মনোজিনী
ও পদপঙ্কজ তুমি শান্তিধারা।
নিস্তার, মা নিস্তারিণী, সংসার-সাগরে-
দিগন্তব্যাপিত ঐ যে অজ্ঞান-আঁধারে
কৃপাময়ি, কৃপা কর, ডুবে মরি! ধর ধর,
তুমি বিনা কেবা আর উদ্ধারে আমারে?
বারে বারে ডাকি তাই, শঙ্করি

পূজার দিনের ধ্যান

অধিবাস: আমার আমি, আমার মনপ্রাণ, আমার দেহমনপ্রাণ, আমার জীবনে ব্যবহার যোগ্য সকল বস্তুকে অধিকার করিয়া তোমার আসনে রচিত হউক।

সপ্তমী পূজা: অতীতের ঘৃণ ও কুসংস্কার যেন নূতন সৃষ্টির পথে বাধা না হয়, প্রতিটি আবেষ্টনে 'আ bojne' অনুভব করিতে হইবে, কোন আবেষ্টনেই পরাজিত হওয়ার অধিকার সাধকের নাই।

অষ্টমী পূজা: বিশ্বের সব কিছুকে অনন্তভাবে পাওয়া, প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া সত্য-রচনা অষ্টমী দিনের সাধনা।

নবমী পূজা: কাম-নেত্রে বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে চাহিলে কিছুতেই সে কামুকের কাছে মাথা নত করিবে না। মাটি জল অগ্নি বায়ু সারা প্রকৃতি, শ্রমিক নারী অরবস্ত্র কিছুকেই ভোগ করা চলিবে না। ভজনার ভিতর দিয়া আপন করার সাধনা নবমী পূজার দিনের।

বিজয়া: বিপ্লব, শৃঙ্খলা ও পরস্পর ভাবনার মধ্য দিয়াই বিজয় লাভ হয়। —শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

মাতৃ-প্রণাম

—শ্রীরেণু মিত্র

সকল রকম অসহায়ত্বের থেকে যা রক্ষা করে বিশ্বের সেই শক্তির নাম মাতৃ-শক্তি—মাতৃত্ব। মানব-শিশুর চূড়ান্ত অসহায়ত্ব থেকে তার বিশেষ এবং চতুর্দিকের মাতৃত্ব কি ভাবে পার করে আমরা সব সময়ই দেখতে পাই।

এই মাতৃ শক্তি বিশ্ব জুড়ে সবাইকে তার অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করে আসছে। মাতৃত্ব তার আত্মবিজ্ঞান প্রভৃতির প্রচণ্ড শক্তি নিয়েও অবস্থা বিশেষে অসহায়—বোধ হয় শিশুর মতই। তাই এই মাতৃশক্তিকে—মাতৃত্বকে—তার প্রয়োজন হয়। গর্ভধারিণী মা যেমন করে আমাকে লালন পালন পরিপোষণ করেছেন তেমন করে এই মাতৃশক্তিই গর্ভধারিণী যখন বর্তমান তখন তাঁর মধ্য দিয়ে এবং তাঁর অবর্তমানে নানাভাবে আমাকে লালন পরিপোষণ করে থাকেন।

এই মাতৃশক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারলে এবং সে উপলব্ধি জড়ের ক্ষেত্রে ভি দান করলে অসহায়ত্বই শুধু দূর হয় না—মানুষ আনন্দিত হয়। ভারতবর্ষ এই মাতৃত্বকে যেভাবে বুঝতে চেয়েছে এবং তাকে যেভাবে জীবনে আহ্বান করে নিতে চেয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু ভিতরের আত্মা নষ্ট হয়ে গেলে সব জিনিসেরই উপযোগিতা ও ঔজ্জ্বল্য যেমন মানই কেবল হয় না, বিকৃত ফল দান করে, তেমনি অবতার-তত্ত্ব তথা পূজা পার্বণের অন্তর্নিহিত অর্থ অন্তর্হিত হওয়ায় আজ ভারতবর্ষে এগুলিকে অবলম্বন করে জড়ের নৃত্য হচ্ছে। কিন্তু এই সব পূজার মধ্যের বক্তব্যটুকু এখনো অনুধাবন-যোগ্য।

মাকে প্রণাম জানাই—সে মাতৃত্ব তথা মাতৃ-বিশ্ব জুড়ে ছোট বড় নর নারী ধনী দরিদ্র সকলের দিকে অপলক কল্যাণী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাঁকে প্রণাম জানাই। আমার মধ্যেই যদি আমি স্নেহ হয়ে যাই কিংবা আমার ছোট্ট সংসারের ছোট্ট পরিধিটুকুতে যদি আমি ফুরিয়ে যাই তাহলে বৃহত্তর কোনকিছু আমার মধ্যে প্রবেশের পথ-পায় না। আমি বৃহত্তরকে আমার মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে চাই—তাই এই বিশ্ব-জোড়া শক্তির কাছে আমি শরণাগত—তাই প্রণাম জানাই—তিনি আমার মধ্যে প্রবেশ করুন, অধিবাস করুন—আমার সবটুকু জুড়ে বসুন।

রক্ষা করা মানে আমার ভেতরে বাইরে যে সমস্ত দুষ্টতা দুর্বলতা প্রবল হয়ে আছে তাদের বিনষ্ট করা—মাকে তাই আমার ভেতর বাইরের মধু ও কৈটভ সংস্কাররূপ মধু কৈটভ অসুরের সাথে লড়তে হয়, আমার বিচ্ছিন্নতারূপী মহিষাসুরকে বধ করে আমার মধ্যে সঙ্ঘ-চেতনা জাগ্রত করতে হয়, আমার মধ্যের সবকিছুকে নিজের ভোগে লাগাবার শুম্ভ নিশুম্ভরূপ অসুরকেও নাশ করতে

হয়। এমন করে ভেতরে বাইরে আমাকে সুন্দরতর নূতনতর করে তুলতে তুলতেই আমাকে তিনি রক্ষা করেন। মাতৃ শক্তিকে এই তিন রূপে দেখে তিন দিনের পূজা হয়ে থাকে শরতের এই কয়টী দিনে যখন বাংলার আকাশে বাতাসে বৃষ্টি-ভেজা ঝলমলে রোদ্দুর মাখা বিরল দিনগুলি কেটে গিয়ে সমস্ত নীলাকাশে নূতন রোদ ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। উপরে নীচে জলের দৌরাত্ম্য থেকে বাস্তু মানুষকে যতদিন আত্মরক্ষা করে চলতে হয়েছে ততদিন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে চলাফেরা করবার আত্ম-ধ্যানের সুযোগ থাকে না—সকলের সাথে মিশতে হবার সুযোগও সেদিন বন্ধ। শরতের ঝরঝরে আকাশে আর শুষ্ক মাটিতে যেমন মাতৃশক্তিকে আহ্বান করার স্বাভাবিক মানসিকতার উপযুক্ত সময়, তেমনি সকলকে আহ্বান করে এই সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করারও দিন।

মাতৃশক্তির এই আরাধনা একলা নিজে নিজে সমাধা করবার ব্যবস্থা করে নি সেদিনের সমাজ-চেতন। অনেকগুলি নদী-সমুদ্রের জল থেকে, শালকাবাড়ীর মাটি থেকে কত কিছু যে লাগে সংগ্রহ করা আজকের দিনের ব্যস্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই সবই বিশেষ ব্যবস্থা দিয়ে কাজ চালানো হয়। সমাজের উঁচু নীচু সবাইকে দিন মায়ের পূজায় আহ্বান করা হয়। বৃন্দিষ্ট বস্ত্র-শিল্পী থেকে সমাজের সকল রকম ব্যবসায়ী সেই সেদিন দরকার হয়। সবাই মিলে এই সে আয়োজনের ভার যাতে উচ্ছৃঙ্খলতায়, ইতরামিতে পরিণত না হয় সে দৃষ্টি সেদিন ছিল। কিন্তু আজ যেখানে সুবিধাবাদটাই জীবন-ধারণের মূল দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে পূজার নামে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা বা ইতরামি দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? পূজাকে সার্বজনীন করাটা ভাল কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সার্বজনীনতার পিছনে প্রথম চাঁদা আদায় থেকে শেষ ভাসান পর্যন্ত যা হয় তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত স্থিরপ্রজ্ঞ মানুষের প্রবল অভাব হয়ে গেছে—সমাজ আজ এমন এক স্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মায়ের পূজার নামে এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইতরামির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত রুচি ও বীর্য আমাদের লাভ হোক এই প্রার্থনা মায়ের কাছে।

মায়ের পূজায় কি শিখব? শিখব সকল রকম সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার অব্যাহত গতি রক্ষা করার মানসিকতা। কু সংস্কার যেমন জীবনকে বেঁধে রাখে সু সংস্কারও তেমনি জীবনকে এগোতে দেয় না, অথচ বাস্তবের গতি সম্মুখে প্রসারিত। মায়ের পূজায় আরো শিখবো যে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে—আমার আবেষ্টনের সুযোগটুকু গ্রহণ করব কিন্তু তা শুধু নিজেকেই মনে রেখে প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ মানসিকতা দূর করতে হবে শিশুকাল থেকেই। দলাদলির মন মা বরদাস্ত করবেন না—তিনি সকলের মা—আমার দল বাঁচবে আর অপর দল মরুক— এ মন নিয়ে মাতৃ-পূজা হয় না। সকলের মিলেমিশে বাঁচব—এই ভাব মাতৃ পূজার লাভ করব। আরও শিখব যে আমার ক্ষমতা আছে অতএব এ বিশ্বের যা কিছু সুন্দর তা আমারই ভোগ্য—এ হতে পারে না। এ বিশ্বের কিছুকেই কেউ ভোগ করতে পারবে না—প্রত্যেকে প্রতি বস্তুকে ভজনা করবে। ভোগ করার অর্থ হচ্ছে সে বস্তু আমার অধীন হবে—

আমার খেয়াল খুশী চরিতার্থ করবে, তার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকবে না—সে আমার। এ মনোভাব নিয়ে চলবে না—যত ক্ষুদ্রই হোক এ বিশ্বে প্রত্যেকেরই একটা সত্তা, অস্তিত্ব, মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। এত সব কথা আছে মাতৃ-পূজার আড়ালে আছে দেশ কাল পাত্র জাতি বর্ণ দল নির্বিশেষে এই বাস্তব জগতের মাটিতে সকলের সঙ্গে মিলনের কথা; আধ্যাত্মিক স্তরে সমাজ-জীবনের বাইরে বনের মধ্যে নিজের মনে সব কিছুর ব্রহ্মস্বাদনের কথা নয়, আছে জগতের মধ্যে এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতির কথা এত কথা—মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের এত সূত্র—ছড়িয়ে আছে ভারত-বর্ষের চিন্তাধারার মধ্যে অথচ আমরা তার খবর রাখিই না। সেগুলি যেভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিয়ে আধ্যাত্মিক মানুষের ধ্যানে বা অনুষ্ঠানে টিকে আছে তাতে সেগুলিকে বাস্তববাদীরা, সমাজ সংসারের মঙ্গলকামীরা অবাস্তব বোধে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে এবং বাস্তব জীবনের কল্যাণের চাবি হিসাবে ভারতবর্ষের ত্রিসীমানায় কাউকে খুঁজে পাবে না, তাদের আমদানী করতে হবে বিদেশ থেকে এতে আর আশ্চর্য কি? যে ভারতবর্ষের মানুষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের 'রাজগুহ্য, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' প্রভৃতি কথারও শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে চালাল, তার কপালে লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না এতো জানাই কথা। মাতৃ-পূজার গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও যা বাস্তব জীবনের কল্যাণ বা সমাধান বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বই শুধু বলেছেন তা নয়। তিন দিনের পূজা-তত্ত্বের যে সামান্যটুকু এখানে সন্নিবেশ করা গেল তাতে বাস্তব জীবনের কল্যাণ মূর্তিতেই মায়ের প্রকাশ হয়েছে। বাস্তব জীবনকে যদি সামগ্রিক ভাবে শুদ্ধ পবিত্র করতে পারি তাহলে এবং তখনই আধ্যাত্মিক চেতনা বা উপলব্ধির কথা উঠতে পারে। কিন্তু আজকের যারা বাস্তব জীবনে চোরা-কারবারী, অপরকে ঠকিয়ে বঞ্চিত করে মিথ্যার স্বর্গতরী বেয়ে যারা ধন পুঞ্জীভূত করেছে কিংবা যারা অপরকে ছোট মনে করে, অপরের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা না দিয়ে নিজেদের কৌলীন্য-অভিমানের তুঙ্গে সকলের থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে, তারাই যখন সমারোহে মাতৃ-পূজা করে তখন সে পূজাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া উপায় কি? কিংবা পূজার সাথে দল বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক বা খানিকটা দূরবর্তী আধিপত্য বা সুযোগ সুবিধা লাভই যেখানে সত্যিকারের কথা সেখানে সে পূজাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যাহোক, আজ এই সদ্য মুক্ত নীলাকাশে, শরৎ-ভরা বাসে, শিউলী-পদ্মের অঞ্জলিতে মাকে—'বিশ্বমাতৃ-শক্তিকে—আমরা প্রণাম জানাই—আমরা সে শক্তির শরণাগত—তিনি আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস দূর করে আমাদেরকে শক্তিতে, বীর্যে, সংকল্পে, সত্যে অটুট রাখুন, আমরা সব দেশ জাতি সম্প্রদায় জাতি-বর্ণ-দল শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মিলে মিশে থাকব—এক মানুষ-জাতি হিসাবে বাঁচব—সেই শক্তি আমাদের প্রদান করুন।

প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ বিপিন বিহারী সেন

—ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্র চৌধুরী

"ও তিনি তো গরিবের বাপ্-মা।"

কথাগুলি আমি ছাত্রই শুনিতাম যখন যাই ময়মনসিংহ শহরে ১৯১৬ সালে। মনে প্রশ্ন জাগিত, ইনি কে যাহার সম্বন্ধে শুনি এই সব সশ্রদ্ধ উক্তি কি শহরে কি গ্রামে? অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহার নাম ডাঃ বিপিন বিহারী সেন, স্বনামধন্য ব্যক্তি ময়মনসিংহ জেলায়। পরে অবশ্য তাঁহার পুত্ত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল চিকিৎসা রাজনীতি ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে। তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি অতি নিকট হইতে এবং মুগ্ধ হইয়াছি অতুল মানবতার বিকাশ দেখিয়া তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তিনি যে কেবল সুচিকিৎসকই ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছিলেন একজন মানবদরদী ব্যক্তি, বিশেষ ভাবে দরিদ্রের "বাপ-মা"। তাঁহার ঔষধালয়টি ছিল, বলিতে গেলে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। দরিদ্র রোগী দেখিয়া ফলতো তো নিজেনই না পরন্তু দিতেন তাদের প্রয়োজনীয় সব ঔষধ বিনা মূল্যে, এমনকি তাদের পথ্যের ব্যবস্থাও করিতেন নিজ ব্যয়ে। এতদ্ভিন্ন কত দুস্থ ব্যক্তির যে অশ্রু মোচন করিয়াছেন তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া, কত দরিদ্র ছাত্রকে দিয়াছেন অন্ন, দিয়াছেন পথ বিদ্যা-শিক্ষার জন্য তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে তো তিনি বেশ ঋণগ্রস্তই হইয়া পড়িয়াছিলেন এই সব কার্য করিতে গিয়া। তথাপি কিন্তু বিরতি ছিল না তাঁহার দেবার কার্যে। গান্ধীজির গঠনমূলক কার্যের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ আকৃষ্ট। তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বিশেষ ভাবে হরিজন ও সমাজের অনুন্নতদের সেবায়। মাদক দ্রব্য বর্জন করিয়া হরিজনরা যাহাতে সুষ্ঠ জীবন যাপন করিতে শিখে, তাদের ও অনুন্নতদের ছেলেমেয়েরা যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে তৎ প্রতিও তাঁহার ছিল বিশেষ লক্ষ্য। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে ও প্রচেষ্টায় দুইটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং হরিজন পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একটি প্রাথমিক ও একটি নৈশ বিদ্যালয়।

অসহায়তা ও অন্যান্য কারণে সমাজ-বর্জিতা নারীদিগের পুনর্বাসনের জন্যও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। বলিতে গেলে এমন কোন জনহিতকর কার্য বা প্রতিষ্ঠান ছিল না যার পিছনে না ছিল তাঁহার প্রত্যক্ষ অবদান। মিউনিসিপেলটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন তিনি অনেকবার এবং তাঁহার কার্য-দক্ষতার জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন সকলের।

শুনিয়াছি ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। তখন তিনি একটি সেবা দল গঠন করিয়া জনসেবায়ও ব্রতী

হইয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন তিনি একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী—সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তিনি দেশবন্ধুরও অনুরক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনিই ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ কিন্তু আদর্শ-নিষ্ঠার জন্য তিনি অবলীলায় সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হন। গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ এবং লবণ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণও করিয়াছিলেন। একদা কিছু দিনের জন্য তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন দেখিয়াছি রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা ছিল তাঁহার বিরুদ্ধবাদী এমনকি যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইতেও দ্বিধাবোধ করে নাই, তাদের প্রতিও ছিল তাঁহার কি অপরসীম স্নেহ ও মমতা। তাহারা যখনই দলগত বা ব্যক্তিগত ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে তখনই তিনি সকল প্রকার সাহায্য নিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাদের পাশে। তাদের কেহ জেলে গেলে তাদের অসহায় পরিবারকেও সকল প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। প্রাণের দিক হইতে তিনি যে কত উন্নত ছিলেন তাহা বুঝাইতে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ময়মনসিংহ জিলার মহকুমা শহর নেত্রকোনায় নিখিল বঙ্গ যুব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত নির্বাচিত হইয়াছেন সভাপতি। নানা বাধাবিঘ্ন ও ভ্রুকুটী উপেক্ষা করিয়াই যতীন্দ্র মোহন আসিয়া পৌঁছিলেন ময়মনসিংহ শহরে এবং হিন্দু মুসলমান সকলে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা দেশপ্রিয় শহরবাসীর নিকট একটি ভাষণ দেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন হইল। বিপিন বাবু যতীন্দ্র মোহনকে নিয়া যেমন বাহির হইলেন বাইবেন সভাস্থলে, দেখা গেল একটি লোহার ডাণ্ডা তাঁহাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং বিপিনবাবুর মাথা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। অল্পের জন্য বিপিন বাবুর জীবন রক্ষা পাইল এই ঘটনায় জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশপ্রিয় ও বিপিনবাবুকে হত্যায় উদ্যত যুবকটি ধরা পড়িল। যুবকের বিপদ বুঝিয়া বিপিনবাবু ক্ষিপ্ত গতিতে দৌড়াইয়া যুবকটিকে টানিয়া আনিয়া নিজ বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ফলে যুবক চরম লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই মহৎ প্রাণের অধিকারী বলিয়াই বিপিনবাবু শ্রদ্ধেয়নীয় ব্যক্তি ময়মনসিংহবাসী কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের কাছে। পরে জানা গেল ঐ যুবক বিপিনবাবুর অর্থ সাহায্যেই বি. এ পর্যন্ত পড়িয়াছিল। এই ঘটনায় দেখা গেল সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি মানুষকে মানবতার কত উর্দ্ধস্তরে উপনীত করিয়া দিতে পারে, আবার ঘৃণ্যনীয় নেতৃত্বের লোভে নত লাঠি ও ছোরার রাজনীতি মানুষকে অধঃপতনের কত নিম্নস্তরে অবনমিত করিতে পারে। তৎকালে সুষ্ঠু রাজনীতির ফলে যেমন শত শত বিপিন সেনকে দেখা গিয়াছিল তেমনি অপর দিকে সৃষ্টি হইয়াছিল শত শত পথভ্রষ্ট যুবকের যার কুফলে বাংলার বিষাক্ত প্রভাব এখনও প্রশমিত হয় নাই। বলা বাহুল্য রক্তপাতের আশঙ্কায় যুব সম্মিলন স্থগিত হইয়া গেল।

৮ই জানুয়ারী ১৯৪৭ সন। সর্ব্বত্র উৎকণ্ঠা—কখন কি হয়। দলে দলে লোক আসিতেছে শহর ও গ্রাম হইতে। সকলেরই বিষণ্ণ বদন, একই জিজ্ঞাসা—বিপিন বাবু কেমন আছেন, ভাল হইয়া উঠিবেন তো? কেহ কেহ বা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া ঘড়ির কাঁটা বৈকাল একটায় আসিয়া পৌঁছিল বিপিন বাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন একটি মহাপ্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হইল চিরদিনের তরে বিপিন বাবুর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র স্কুল কলেজ বন্ধ হইল, বন্ধ হইল হাট বাজার দোকান, ময় কোর্ট কাছারি। চারিদিকে হাহাকার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল। শহরময় বিষাদের ছায়া। সহস্র সহস্র লোক হিন্দু মুসলমান যোগ দিল মৌন শবযাত্রায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, বালক রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইয়া আছে শেষ বারের মত তাদের ও আপনার শ্রদ্ধেয় বিপিনবাবুকে দেখিবার জন্য। কেহ বা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে শবাধার লক্ষ্য করিয়া, কেহ বা করিতেছে নমস্কার হাত জোড় করিয়া, আবার কেহবা ডাকিয়া পড়িতেছে কান্নায়। সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। নানা পুষ্পে সজ্জিত শবাধার শহর পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে মহাপ্রস্থানের পথে। কখনও শুনা যাইতেছে হা ভগবান কখনও বা হা আল্লা; আবার কখনও ধ্বনিত হইতেছে অস্ফুটস্বরে আল্লাহো আকবর, কখনও বা বন্দেমাতরম্।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(১৯৪৬)

মোর ঘড়িটা পাওয়া যাইতেছে না। শিয়রের দিকে তাকের উপর ছিল কাল রাত্রিতে কি হইয়াছে? রাত ১০টার সময়ও দেখিয়াছি। আজ এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল না! কি ভাবে ঘড়িটি চলিয়া গেল। এই ঘড়িটা গোঁসাই দিয়াছিল, তাহার বিবাহের যৌতুক ছিল। মিণু আগামী শুক্রবার আসিতে পারে। রেণু বাহির হইতে প্রিমিয়ার হইতে চেক ও বিজ্ঞাপন আনে। ...কিতীন রায়ের কি অবস্থা! ... সে ফেব্রুয়ারী তাহার ভাইঝির বিবাহ গিয়াছে মানুষের কি সম্পর্কের একটা মূল্য বোধ নাই? এখন আমাকে 'শুরু' করিবে, অথচ সে চলিয়া গেল, বলিয়াও গেল না। এই তো বর্তমানের অবস্থা! ইহাকে কি করিয়া আমি গড়িয়া তুলিব? আসাইয়া বাঁচা ছাড়া তো উপায় ছিল না, অথচ ঠাকুর, তুমি বাঁধিয়া রাখিয়াছ তোমার

দর্শনতারা আমার এই সংসারের সঙ্গে। আমাকে দিবে শক্তি দেও। ১৯শে ফেব্রুয়ারী

জীবনের সকল বৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া জীবনের এপারে শ্রীভগবানকে পাওয়াই ছিল এতদিনকার সাধনা, ভগবান ছিলেন ও আছেন জীবনের বাহিরে। ভগবানের নাম মানুষ নেয়, কিন্তু জীবন বদলাইবার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু ভগবান তো জীবনবল্লভ, জীবনধন জীবনকে যে ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া লইলে কৃষ্ণ লাভ হয়, তাহাই ভগবদ্ধ জীবনের ভক্তই ভগবান এই ভাবেই ভগবানকে আমি বুঝিয়াছি এবং এই ভাবেই অনন্ত ঘটনার ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতিকে ভগবদ্ভাবে রচনা করিতে করিতে অনন্ত কাল চলিতে হইবে। এতদিন ছিল জীবনকে সঙ্কুচিত করিতে করিতে, সকল বৃত্তিকে নিরোধ করিতে করিতে চলা, এইবারের সাধনা হইবে জীবনকে ব্যাপকতর করিতে করিতে সকল বৃত্তিকে প্রসারিত করিতে করিতে অনন্ত কাল চলা। ভগবদ্ধন creative। এই সৃষ্টি অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে। তাই তাহার মুক্তি নাই মুক্তি নাই তাহাদেরও যাহারা সকল বৃত্তির নিরোধ করিয়া চলিতে চায়। কেননা, প্রকৃতি যে নিত্য অনন্ত; অনন্ত বস্তুর নিরোধও অনন্ত কাল করিয়াই চেষ্টা করিতে হইবে, ফলে লাভ হইল নিরোধ-পথে একটা নৈরাজ্যবাদ; আর ব্যষ্টির পথে সাম্রাজ্যবাদ। জীবনে মুক্তি বন্ধন দুই-ই নিত্য, পারমার্থিক। নিরোধ পথে সমাজ-গঠন ব্যবহারিক মাত্র। উহার কোনও আদর্শগত নিত্যতা নাই। ছাড়িবার জন্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যষ্টির পথে সমাজ রাখার জন্যও রাখা। ইহাই পূর্ণতার সাধনা। নিত্যগোপাল অন্নপূর্ণ হইল। রেণু জ্যোতীশবাবুর বাসা হইতে ৬টী কোন করিয়া হাইটাল বিল্ডিং-এ উদ্বোধনের বিল দিয়া মমতলায় কুমার কোম্পানী হইতে বিজ্ঞাপন লইয়া, প্রেস হইয়া সন্ধ্যায় ফেরে। সাতান্নী সকাল ও বৈকালে আসে। সে এইবার ছেলের পাল্লায় পড়িয়াছে, দেখা তো এইবার ঠিক হইবে। রমেন্দ্রও ছেলের পাল্লায় পড়িয়া কংগ্রেস বিরোধী হইয়াছিল। গতকল্য বিষ্ণুপদ বেণুর কাছে এক পত্র লেখে। ১৩ই মার্চ

'রসো বৈ সঃ' পুরুষোত্তম রসঘন। পুরুষোত্তমকে জীবন দিয়া উপলব্ধি ও আস্বাদন করিতে হয়। একান্ত ক্ষরতা বা অক্ষরতা, একান্ত জগৎ ভাব বা ঈশ্বর-ভাব, একান্ত পরিচ্ছিন্নতা বা অপরিচ্ছিন্নতাদ্বারা ধরিতে গেলে 'রস'ই বাহির হইয়া যায়। 'রস' বাহির হইয়া গেলে দুই-ই bloodless category-তে পরিণত হয়। তখন কেহ-ই কাহাকেও পায় না, পাইতে গেলে দুই ই শূন্যে মিলাইয়া যায়। রস সাধনাদ্বারা, রসায়নদ্বারা পরস্পর স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও পরস্পরকে পায়। জীবনই যে রসায়ন-শাস্ত্র। এখানের সব কিছু সম্পর্কই রাসায়নিক। বিশ্বও রসধর্মী, বিশ্বেশ্বরও রসধর্মী, বিশ্ব-বিশ্বেশ্বরের সম্পর্কও রসঘন। ইহার মধ্যে একান্ত ভাবে ছাড়িবার বা রাখিবার স্থান নাই। এই রাসায়নিক সম্বন্ধের মাঝে কি করিয়া কত কম 'মনের' সৃষ্টি হয়, তাহাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরুষোত্তম-জীবনই নির্মল জীবন। অপরিচ্ছিন্ন নিষ্কাম ঈশ্বর এখানে চায় পরিচ্ছিন্ন সকাম জীবকে, পরিচ্ছিন্ন সকাম

ব্যক্তিগত-জীবন জীব চায় অপরিচ্ছিন্ন নিষ্কাম সমষ্টি-সত্তাধান ঈশ্বরকে। কেহই একান্ত পূর্ণ নন। রস-সাধনার মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন-অপরিচ্ছিন্ন পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। একান্ত অপরিচ্ছিন্নতা আমার একান্ত পরিচ্ছিন্নতারই relative; কারণ মূলত: পরিচ্ছিন্নই, তবে কিছু ব্যাপক পরিচ্ছিন্নতা। অপরিচ্ছিন্নতার সময়ই সত্য বাস্তব অপরিচ্ছিন্ন।

রেণু ২টায় বাহির হইয়া অপেন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ফেরে ১১॥ টায়। আবার ১॥ টায় বাহির হইয়া ফেরে ৪টায়। বাস্তুঘুঘির অনুকূলবাবু (কন্ট্রাক্টার) আসে, পরে আসে ফিটার রায়। সে যায় ৮টায়। সন্তোষ শাস্ত্রী আসে, অমরেশ ভট্টাচার্য আসে সন্ধ্যার পর। ১০৲ টাকা দেয়। সে নবদ্বীপ election-এ দাঁড়ায় নাই। সে কাল ১টায় রেণুর সঙ্গে বাস্তুঘুঘিটি যাইবে। উজ্জ্বলভারত (কাগজ) রাত্রি ৯টার পর আসে।

১৭ই মার্চ

গত পরশু ভোরে দশগ্রামের হেডমাস্টার ঈশ্বর প্রামাণিক আসিয়াছিল। সে 'সমাজ উন্নয়ন' (সরকারের) পরিকল্পনা হইতে টাকা আনার কথা জোর দিয়া বলে। সেখান হইতে টাকা আনিতে হইলে যে বুদ্ধি ও কৌশল লাগে তাহা আমার নাই। কেন্দ্রীভূত অর্থের সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন্দ্রীভূত অর্থ পাইবার কে যোগ্য, তাহা শক্তিমান বিচার করিতে পারে। হৃদয় বিকেন্দ্রীভূত অর্থই দিতে পারে। আমার জীবনে কেন্দ্রীভূত ধন-কুল-বিদ্যা কিছুই আসিবে না। আমি সাধারণ মানুষের একজন। জন সাধারণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহ করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে। ধনী কুলীন পণ্ডিত আমি চিনি না; আমি ছেঁড়া মাদুরের দলের লোক। বরিশালে যখন আমার প্রতিষ্ঠা দলদল করিতেছিল, তখনই কি আমি সেখানকার বড় লোকদের বাড়িতে আনাগোনা করিতাম? সুরেশ গুপ্ত, সতীশ দাস, হরেন্দ্র ঘোষ, হেমন্ত দাস, বনমালী বসু, সূর্য সেন প্রভৃতির সঙ্গেই ছিল আমার ঘোরাফেরা। আমি কেন্দ্রীভূত ধনের বিরুদ্ধে। ধনীরা আমাকে ধন দিবে কেন নিজ স্বার্থ আনিবার জন্য? তাহারা মুখ চেনিয়া চেনে কে তাহাদের কেন্দ্রীভূত ধনের বিরুদ্ধে। আমার জীবন, আমার কর্মপন্থা, আমার সারা জীবনের তপস্যা মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে টাকা আসিবে না। সহজ কথায় টাকা কেহ দিবে না। টাকা পাইতে হইলে বুদ্ধির, কূটনীতির, বক্রপথের দৈন্য স্বীকারের আশ্রয় নিতেই হইবে। তাহা পারিব না। ঠাকুরের চরণে মাথা রাখিয়া চলিব। যাহা আসে তাহা দিয়া কাজ করিব। রেণু ১১টার পূর্বেই বাড়ির হইয়া হিন্দুস্থান হইতে অমরেশকে লইয়া বাস্তুঘুঘি যায়, কিতেনবাবু ও নীরোদবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বড় কোদাল, খালাস্যাস, কোদাল-কুদি প্রভৃতি কিনিয়া ৭॥ টায় ফেরে। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে কোঠাঘর, পাকের ঘর পায়খানা শেষ হইবে। রেণু বৃহস্পতিবার যাইবে। সন্তোষ ভট্টাচার্য আসে। আলোচনার রিপোর্টগুলি ঠিক করিয়া লয়। আমার বইগুলি ও পত্রিকা অর্ধমূল্যে সে চায়। মিণু আজ আসিল না।

২রা মার্চ

পতিগত-প্রাণ নারী স্বামীসেবার জন্য স্বামীর কাছে যে কামনা করেন, তাহা সকাম নয়, তাহা নিষ্কাম। স্বামী দেন সংসারের আদর্শ, ব্যাপকতার

দিকে প্রেরণা, তাই তাহার পক্ষে সংসারের সব কিছু বাস্তব ছোটখাট বিষয়ের দিকে পুরাপুরি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়, উচিত নয়। স্বামীর কাছে সেই সব দিকের ঘটনা পৌঁছাইবার ভার স্ত্রীর উপর যাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্ত্রীরই। স্ত্রীকে তাই সকাম হইতেই হয়। স্ত্রীর যে যে দিকে কামনা, সেই সেই দিকেই স্বামী আদর্শগত দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহা আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা দিবে। স্ত্রীর এই কামনা না থাকিলে স্বামীর পক্ষে ছোটখাট বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয় না। সেবার মধ্যে এই সকাম ভাব প্রচলিত নিষ্কাম হইতে উচ্চতর ও মধুরতর। কামের যাহা অভাব, তাহা কামেরই অপর এক অংশ সকাম নিষ্কাম সমন্বয়ই পুরুষোত্তম কাম। কোন্ পথে পুরুষোত্তম আদর্শকে প্রবাহিত করিবেন তাহা জানিয়া উঠে ভক্তের কামনার মধ্য দিয়া। পুরুষোত্তম-কামিনী হইয়াই ভক্ত কাম কামনা করেন। তাহাই গোপালতাপনী উপনিষদের কাম 'অকাম'। এই ভাবেই ধনং দেহি জনং দেহি ইত্যাদি সকাম প্রার্থনা সার্থক, নিষ্কাম ভাব। অমরেশ আসে ১০টায়। কিছু পরেই বৃন্দাবনের দ্বিজেনবাবুর পুত্র নৃপেন আসে। নৃপেনের সঙ্গে কথা হয়। মিনু, স্বপ্না ও সুধীরের পুত্র দুলাল আসে। ধ্রুব আসে। নীপুও আসে। সকলেই এখানে প্রসাদ পায়। রাজেন আসে, নগেন মুখার্জী আসে। মিনু প্রারম্ভিক সঙ্গীত গায়। ভক্তিযোগে 'শীঘ্র' হয় ও 'সুবিচার' হয় —ইহা আজও আলোচনা হয়। প্রথমে প্রাণের দিক দিয়া ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইলে পরে গুণ-মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবেই হয়। 'তোমার আমি'—এই বলিয়া বরণ করিলেই, তিনি আমি এক হইলেই সব কিছু আপনা আপনি হয়। দাতা গ্রহীতার সম্পর্কের ভিতরে অনেক বিধিনিষেধ থাকে, আপন সম্বন্ধ কিছুতেই আসিতে চায় না। আগেই আপন করা আপন হওয়ার সম্পর্ক হওয়া চাই। ৫ই মার্চ

যাহার সঙ্গে জীবনে এক দিনের জন্যও দেখা, যাহাদের স্নেহ একদিনের জন্যও পাইয়াছি, আমি তো তাহা ভুলি না। আমার কাছে প্রতিটী ক্ষণ যে অনন্ত, কালাতীত। আমি সেই স্নেহ অনন্ত কাল বহন করিয়া চলব। কাল ১১টায় অমরেশের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত বৃন্দাবন থাকাকালীন বন্ধু দ্বিজেন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র নৃপেন্দ্র রায়চৌধুরী। অচিন্ত্যসখার মন্দিরের সেবাইত ছিলেন দ্বিজেনবাবু। তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার বিধবা শ্যালিকা আমাকে কতই না প্রীতির সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। দ্বিজেনবাবুর শ্যালিকা যখন মারা যান তখন আমি সেখানে ছিলাম। কত রাধাকৃষ্ণ কথাই না হইত। নৃপেনকে দেখিয়া চোখে জল আসিল অতীতের সব কথা জানিয়া উঠিল—গোবিন্দের মন্দিরের সামনে সেই বক্তৃতার কথা যাহার ফলে বৃন্দাবনের সব কূপগুলি সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বৃন্দাবনের কূপগুলি হইতে মুসলমান ভিস্তিওয়ালারা চামড়ার থলে দিয়া জল তুলিত, অথচ হিন্দু যোগ্য তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। মনে পড়িল সেই অস্পৃশ্যদের বাড়ী মাধুকরী করার কথা। দ্বিজেনবাবু গোবিন্দের মন্দিরের সামনে বক্তৃতার উদ্যোক্তা ছিলেন। সকলকে জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া চলিয়াছি।

আমি যে বিশ্বজন, বিশ্ব-নাগরিক। কত লক্ষ লোকের স্নেহের ফলে আজিকার 'আমি' গড়িয়া উঠিয়াছি! আমি 'এতখানি', আমি 'এইরূপ-ই'। স্বপ্না আশ্রমেই থাকিবে, মোটামুটি ঠিক হইল। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া থাকিতে কষ্ট অনুভব করে।

সব দায়িত্ব নিতে হইবে কিনা তাহা বর্তমানে ভাবিয়া কি লাভ? ·····স্বপ্নাকে পড়াইতেছি। প্রতি ৮। বিরজার বাড়ী যায়, সন্ধ্যায় ললিত সরকার আসে। ৪ই মার্চ

সাম্প্রতিকালে বহু অবতার বর্তমান সময়ে —রামকৃষ্ণ, সারদামণি, বিজয়কৃষ্ণ, অরবিন্দ, ঐমা, অপরেশ, অবধূতঠাকুর, আনন্দময়ী, নিগমানন্দ, দয়ানন্দ, ঠাকুর অনুকূল, রামঠাকুর, আরও আছেন। এত অবতারের মধ্যে শ্রীনিতাগোপালকে একজন দাবীদার হিসাবে দাঁড় করাইতে আমার স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচ চিরদিন ছিল, আজিও আছে। জীবনের প্রায় ১৫ হাজার বক্তৃতার মধ্যে নিতাগোপালের নাম উচ্চারণ করি নাই—অথচ তাঁহারই দর্শন যে বলিতেছি তাহা তো জানিতাম। এখন তাঁহার নাম বলিতেছি। কেন? বক্তৃতার প্রারম্ভে নমস্কার শ্লোক পাঠের সময় 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' শ্লোক দুইটী উচ্চারণ করিতাম। নিতাগৌরবানন্দ আমাকে নিতাগোপালের নমস্কার শ্লোক বলিতে বলিতেন। অবতারবরিষ্ঠ লইয়া যে ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার চলিতেছে, তাহাতে নিতাগোপাল লইয়া আবার এক সম্প্রদায় খাড়া করিতে আমার উদ্বেগ বোধ হইত। আমি জানি যেমন বিশ্বের সব মানুষ কৃষ্ণ-ভজনা করিবে না, যীশু বা মহম্মদের ভজনা করিবে না, তেমনি প্রার্থনা করিলেও কোন দিন সারা বিশ্বকে নিতাগোপাল-ভক্ত বানানো যাইবে না। তবে জগন্নাথের কি হইবে? আমি জগন্নাথ চাই। নিতাগোপালের 'I am a cosmopolitan' হইতে চাই। কে কতখানি অবতার, কাল তাহা নির্ধারণ করিবে। কৃষ্ণের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া লাভ নাই। কাল প্রমাণ করিবে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আমি কেন নিতাগোপালকে 'ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়' বলিয়া আলোচনার প্রণাম করি, তাহা বলিতেছি। রেণু ১টায় বাহির হইয়া জীবন মজুমদার, কমলালয় কিরণ লাম্প, মিশুর ঔষধ কেনা ইত্যাদি করিয়া ফেরে আটার পর রেণু 'পুরাণ প্রেসে' গিয়াছিল। শিশির ব্রহ্মচারীর এক চিঠি লইয়া আনন্দময়ী আট প্রেসের পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক আসেন উজ্জ্বলভারত ছাপাইবার জন্য। কথাবার্তা হয়। আশুবাবু নারায়ণবাবু আসেন, প্রায় দুই ঘণ্টা কথা হয়। তাহাদের বই দুখানা চাহিয়া রাখিয়া দেই। অক্ষর-অক্ষর পরমাত্মা পুরুষোত্তম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। সত্যেন স্বামী আসে ১০টার পর। নিতাগোপাল আমার জীবনে কি ও কেন তাহা বলি। ৬ই মার্চ

শ্রীনিতাগোপাল আর কাহারও কাছে না হউন অন্ততঃ আমার কাছে বিশ্ব-জগতের সকল সমস্যার মীমাংসাদাতা হিসাবে আসন করিয়া বসিয়াছেন। 'জড়ে জড় সমন্বয়' প্রভৃতি মন্তব্যগুলি কি আর কেহ বলিয়াছেন? তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিলাম—বর্তমানে যুগের সর্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা দিতে শ্রীনিতাগোপাল-জীবন যেমন পারে, অন্য কোনও জীবন তেমন পারে না। এক দিন 'কাল' ইহার সাক্ষ্য দিবে। ঠাকুর

'জেরি' করা পছন্দ করিতেন না। সহজ জীবন কখনও জেরি করা পছন্দ করিতে পারেন না। আমার তাঁহার কথা আজ বলিতেই হইবে। আমার উপলব্ধির কথা বিশ্বকে শুনাইয়া যাইব। কাহারও উপর কিছু চাপাইবার বুদ্ধি আমার নাই। কিন্তু আমি এই তত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা না বলিলে আমার সমন্বয়-তত্ত্ব বলার ভিতরে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার থাকিয়া যায়। তাই আমার স্বীকার করিতেই হইবে। তত্ত্ব আছে অথচ এমন কোন জীবন নাই যেখানে ঐ তত্ত্ব ঘনীভূত হয় নাই, এমন হয় না। কিরণ আছে কিরণের ঘন প্রকাশ সূর্যেরও থাকা চাই। জীবন ছাড়া তত্ত্ব ভাবুকতামাত্র। সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত হয় এই ভয়ে এত দিন নিতাগোপালের কথা বলা হয় নাই। আজ আমার দিন নিকট। সত্য কথা বলিয়া যাইব। যাহার ইচ্ছা নিবে ইচ্ছা না হয় নিবে না। আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস নিতাগোপাল-তত্ত্ব বিশ্বকে নিতেই হইবে—দুদিন পূর্বে বা পরে। আমি অপেক্ষা করিব। যত বারবার নিতাগোপাল আসিবেন, আমিও রূপ বদলাইয়া আসিব। হনুমানের মত গোত্তামি করিয়া 'তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ' বলিব না। নিতাগোপাল আমার সব, আবার কেউ নন। তাঁহার জয় হউক। ঠাকুরের আসনের জন্য তোষক বালিশ তৈরী করিয়া আনে বেণু। সন্তোষ আসে। প্রতিভা হরিদাসীর বাসায় ও মহানির্বাণ মঠে যায়। শনিবার বাড়ীআটি যাইবার কথা, তাই যায় অথবা শুক্রবার আসিবে। সন্ধ্যার পূর্বে উপেন্দ্র রায়চৌধুরী বেরিশাল মানপাশা, রবিবারের শ্রোতা) আসেন। 'দীক্ষা তো অনেকেই নেয়, ফল হয় না কেন'—এই প্রশ্ন করেন। যথাসম্ভব উত্তর দেই। ৭ই মার্চ

জীবনে কাহারও 'দান' অস্বীকার করি নাই। কংগ্রেস জন সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, অনেক কিছু অবিচারও দেশবন্ধু দাসের হাতের কংগ্রেস সঙ্গীন সেনের মারফত করিয়াছিল, যাহার জন্য 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহাদের নীতি ছিল, 'no method is too mean', 'End justifies the means'। অনাচার সৃষ্টি করিয়া no-changer কংগ্রেস-সভা পর্যন্ত ইহারা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় 'অনাচারে' ইহারাই আনিয়াছেন। কংগ্রেসে স্থান সে দিন আমার ছিল না, অথচ কংগ্রেস-সভা না হইয়াও লবন আইন অমান্য আন্দোলনে আমি ছিলাম 'war council'-এর প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেসের 'পিতৃত্ব' আজিও স্বীকার করি। 'In spite of all thy faults, I love thee still'. বুকের রক্ত ঢালিয়া এতদিন যে কংগ্রেসের সেবা করিয়াছি, সেই কংগ্রেস যদি পরিত্যাগও করে, তবুও তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিষোদ্গার করিব না। বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া কি ভিন্ন পথ এমন কি বিরুদ্ধ পথে চলা যায় না? আমি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। কংগ্রেসকে গালি দিয়া পথ রুদ্ধ করিব কেন? একদিন পূর্বকথাও অনেক কিছু আমার জন্য করিয়াছে। আজ সঙ্গে নাই। তাই বলিয়া কোন বিদ্বেষ আমার নাই। সেইই কি মানুষ হউক ইহাই চাই। বিদ্বেষ না রাখিয়া, ভালবাসা বজায় রাখিয়াই নিজে সৃষ্টি করার পথ বাহিয়া চলিয়াছি। কৃপালনী প্রভৃতি বোধের মত কংগ্রেসকে গালি

দিবার প্রকৃতি আমার নয়। ঠাকুর আমার হইন। বেণু ৭ টার পর বাণ্ডইআটি যায় টাকা লইয়া, ফেরে ১০টার পর। পাকা ঘরের floor হয় নাই। শনিবার প্রতিষ্ঠার যাওয়া হইবে না। টাকা জিতেনবাবুর কাছে দিয়া আসিয়াছে। কাঁচা ঘরের খুঁটি পোতা হইতেছে। রাজেন বাণ্ডইআটি গিয়াছিল। চিত্ত সন্ধ্যার পর আসে। সে তাহার টিউবওয়েল আশ্রমকে দিবে। তোলা ও আনিবার খরচ দিব। ১৲ টাকা যাতায়াত খরচ দিলাম। সতীন শাস্ত্রী আসে।

কপি দেই।....৮ই মার্চ

এই কংগ্রেসের হাতে আমার স্ত্রীর অলঙ্কার একদিন বরিশালের কংগ্রেস সভাপতি তারিণী গুপ্তের মারফত সমর্পণ করিয়াছি। কংগ্রেসের সেক্রেটারী প্রভৃতি ইহা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। পুত্রকন্যাদের স্কুলে দেই নাই। সেই কংগ্রেস কি লাঞ্ছনা না করিয়াছে? আমার জাতক্রোধ থাকিতে পারিত। আমি অকৃতজ্ঞ, অবিবেচক, আত্মঘাতী হইব না। কংগ্রেসকে অপমান করার অর্থ আত্মঘাত করা। এ দেশের মানুষের বুকের রক্ত দিয়া, তপস্যা দিয়া গড়া কংগ্রেসকে অপমান করিলে যে তপস্যারই অবমাননা করা হয়। কোন্ প্রতিষ্ঠান আছে কংগ্রেস ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য? সে-ই কিছু করিতে পারে। যাহারা কংগ্রেসের খাইয়া পরিয়া, সে দিনও মন্ত্রী হইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা দেশদ্রোহী। কংগ্রেস ভুল করে, সে-ই শুদ্ধ করিবে। সে দিন অল্প টাকা ছিল চোরও ছোট চোর ছিল। আজ বেশী টাকা, বেশী সুবিধা, চোরও বড়, সুবিধাও বড়। সব চোর তাড়াইয়া বিশুদ্ধ করিতে গেলে কি রাজনিক কার্য চলে? আর বামপন্থীরাই কি কম দুর্নীতি-পরায়ণ? কংগ্রেসের জীবনী শক্তি আছে। ভুলও সে করে, শুদ্ধও সে-ই করিবে। আমি আপন বুদ্ধিতে কংগ্রেসের সমালোচনা করি। মহাত্মাজীকে পর্যন্ত চিঠি দিয়াছিলাম যে তাঁহার সত্য অহিংসা কখনের স্বরের, কৃষ্ণের স্বরের নয়। কৃষ্ণের সত্য অহিংসাই চলিবে। সত্য বলিতে ভয় আমি করি না। শ্রীনিতাগোপাল জ্বরযুক্ত হইল। ক্ষিতীন রায় আসে সকালে। কাল এখানে প্রসাদ পাইবে। জয়া আসে ৯টার পর, যায় ৪টার পর। জয়ার শরীর খুবই খারাপ অথচ তাহা নিয়াই নাকি তাহাকে আগামী মাস হইতে বাঁচিতে হইবে। এই তো সংসারের বিচার।....কেহই কাহারও সত্তাকার আপন নয়। আশুবাবু একবার সকালে আসেন। তিনি কিছু পুস্তক আমাদের লাইব্রেরীতে দিতে চান। আমি সাদরে গ্রহণ করিব বলিলাম। জন্মী হরীতকী খাইয়া কোনও উপকার বুঝিতেছি না। জয়াকে আমার অতীত জীবনের কিছু প্রতিভা পড়িয়া শুনায়। ইহা করা উচিত। ৯ই মার্চ

আমার রাজনৈতিক জীবনের কথা যাহা বরিশাল হিতৈষীতে বাহির হইয়াছিল এবং সুধাংশু কর্তৃক যাহা নকল করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার কিছু অংশ পুনরায় নকল করাকালীন কিছু কিছু অংশ আমাকে শুনাইতেছে। নিজের সেই গৌরবময় উজ্জ্বল জীবনের কথা শুনিতে শুনিতে আবার সেই অবস্থাকে বর্তমানে পাইতে ইচ্ছা হয়! আর একবার বর্তমান কালে তেমনটী হইতে পারিতাম। যাহা বলিয়াছি, মানুষ তাহা

করিয়াছে, সবই ছিল জয়জয়াকার। সেই বীর্য, সেই অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই জনমিয়ন্ত্রণ, সেই প্রাণ, সেই দুর্জয় সাহস আবার আসিবে কি? তাহা হইলে আনন্দে চক্ষু মুদিতে পারিতাম। আজও বুকের ভিতর সেই সিংহ-গর্জন, যাহা বরিশাল কনফারেন্সের ১২ হাজার লোককে প্রায় ১৮টা স্তব্ধ রাখিয়াছিল, টের পাই। তাহা আবার পাইব কি ঠাকুর, তোমার আন্দোলন প্রবর্তন করিবার এই অভিযানে? আজও তো সেই বীর্য টের পাই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এমন করিয়া ঠ্যাং ভাঙিয়া ঘরে বসিয়া নীরবে কি করিব? আর একবার জনসাধারণকে মন্থন করিবার জন্য প্রাণটা পাগল। ইহাই তো সর্বভূত-রতি। আমার জীবনের সঙ্গে সর্বভূতের জীবনের মন্থনের নামই তো বিপ্লব। আমি ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব ক্ষেত্রে বিপ্লবী। সকলেই 'ঘর' ঠিক রাখিয়া বাহিরে বিপ্লব করে। আমি ঘরে বাহিরে বিপ্লবী। নিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন। রেণু ১০টায় বাজে তাহার তহবিল হইতে ১৫৲ ও উজ্জলভারত হইতে ১৫৲ টাকা বাগুই-আটির জন্য তুলিয়া আনে। ক্ষিতীনবাবু আসে আমি যখন খাইতে বসিয়াছি, সে-ও প্রসাদ পায়। নীলু আসে, কাল আসিবে না। চিনু আসে। ষ্টিভবওয়েল তুলিতে ৫৫ টাকা মত লাগিবে। রেণু জীবন মজুমদারের কাছ হইতে ১৫৲ টাকা আশ্রম বাবদ আনে। সন্তোষ আসে। বহু বাবদ ৮৲ টাকা দেয়। অর্ধেক দামে সে সকল বই চায়। উষাঙ্গিনী মন্থর বাসা হইতে সকালে আসে। ১০ই মার্চ

বরিশালের সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাহার 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'অসহযোগের যুগে বরিশালে অশ্বিনীকুমার ছিলেন না। তাই সেখানে দলাদলি শিবার কলরব ও প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য দেখা দিয়াছিল'। এই মন্তব্য নিতান্ত আপত্তিকর, কুৎসিৎ, অনৈতিহাসিক, বাস্তববিরুদ্ধ ও বিদ্বেষদুষ্ট। তিনি অসহযোগের মধ্যে শুধু দলাদলি, প্রেতের নৃত্য দেখিলেন। কত শত প্রাণ যে সেদিন বুকের রক্ত দিয়া দেশ-সেবা করিয়াছিলেন, কত মদপ যে মদ ছাড়িয়া এই মহান আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার মত চক্ষু তাহার নাই। No-changer ও pro-changer-এর কথাই বোধ হয় 'দলাদলি' শব্দদ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাও তো আন্দোলনের অনেক পরবর্তী ঘটনা। আন্দোলন আরম্ভের সময় অশ্বিনীবাবু ছিলেন, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স যখন হয়, তখন তিনি বরিশালে Reception Committee-র সভাপতি ছিলেন, চাঁদপুর ষ্টীমার স্ট্রাইক অবলম্বন করিয়া যে কদিন চরকার খোরাক ক'র, তখনও অশ্বিনীবাবু বরিশালে স্কুল nationaline করার সময়েও বরিশালে। অবশ্য প্রথমে তিনি এই আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না। আর দলাদলি? উহা কবে ছিল না? সুরাটের দক্ষযজ্ঞ দেশ দেখিয়াছে; বরিশালে অশ্বিনীবাবু ও বারিকবাবুর দলাদলিই কি কম ছিল। সুরেনবাবু সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়া ঐ উক্তি করিলে তাহার ঐতিহাসিক সততা বজায় থাকিত। ঐ উক্তি অভিসন্ধিমূলক। রেণু একবার বাহির হয়। রাজেন পূর্বে আসে, বিষ্ণুপদ পরে আসে। ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। মণি বাগচি 'ভক্তিযোগদর্শন' পাঠের পর যায়। অনন্ত দত্ত ও

গজেন্দ্রবাবু আসেন। ....সন্তোষ ১১'৮১ টাকা দিয়া সমস্ত বই নিয়া গেল। ১১ই মার্চ

ভগবান যে-মনস্তত্ত্বকে অঙ্গীকার করিয়া পুরুষোত্তম-রূপে এই বিশ্বকে, মায়াক্ষেত্র বলিয়া পরিত্যক্ত এই বিশ্বকে দিব্যরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য আসিয়াছেন, ব্যক্তি জীবন পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের অন্তরে যে মনস্তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিতেছেন, শ্রীনিতাগোপালের স্নেহলাভ আমি তাহাই সারা জীবন চাহিয়া আসিয়াছি। এই বিশ্বে প্রতিটি অণু, প্রতিটি অংশ পূর্ণ অখণ্ড, কেহ কাহাকে খাটো বসিতে চাহিবে না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে স্বীকার করিয়া অন্যোন্যমিলনে মিলিত হইবে, ইহাই না পুরুষোত্তম-মনস্তত্ত্বের প্রাণ-কথা। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে মাঝখানে রাখিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে 'ছাড়িয়া রাখিবে'। ইহারই নাম নিষ্কাম হওয়া। কামকে নিষ্কামতায়, মদনকে মদন-মোহনে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই চিন্তাধারা কি অন্তঃপ্রবিষ্ট করা সম্ভব হইবে না? এই বিশ্বের সর্ববিধ ব্যবস্থাকে বৃন্দাবনের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেই হইবে। ব্রজের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা আস্বাদিত হইয়াছে। সংসারের নর-নারী কোন্ কৌশলে চলিলে সার্থক হইতে পারে, তাহারই ছবি কৃষ্ণ-গোপীর মধ্যে ঘন হইয়াছে। ব্রজে জড়ও ব্রহ্ম। শিবসুন্দর সত্তার ব্রহ্ম-জড় দেহ-ই আস্বাদন করিয়াছিলেন। রেণু খুব সকালে বাকুইআটি গিয়া জিতেনবাবুকে ৪০০৲টাকা দিয়া আসে কৃপালিবাবুর সামনে। কোঠাঘরটার মেঝে হয় নাই। কেরে ১টার পর। বৈকালে হীরালাল পর আসে, সতীন শাস্ত্রী আসে। সন্ধ্যার পর বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসে, পরে আসেন খগেন ঘোষ। ললিত সরকারও আসেন। প্রতিভা ইন্সুলেথার ওখান হইতে মুষ্টির চাউল আনে। বরিশালের বুকে সি আর দাস, সুভাষবাবু, কিরণশঙ্কর রায় শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া প্রাণটা আমার পাগল হইয়া উঠে। আবার কি তেমন তেজস্বিতা লাভ করা সম্ভব হইবে না? কলিকাতার বুকে কি আবার একটা সিংহ-গর্জন করিয়া যাইতে পারিব না? ঠাকুর, আবার আমাকে সেই অবস্থা দেও। কলিকাতায় যে উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব চলিতেছে। তোমার দর্শন ও জীবন লইয়া কি মহানির্বাণ মঠ আপনার করিতে পারিব না? ব্যর্থতা কাহাকে বলে, তাহা তো শিখাও নাই। তোমার জয় হউক। এক ভদ্রলোকের কাছে হেম গাঙ্গুলীর ঠিকানা পাইলাম। সে নাগেরবাজারের কাছে থাকে। সে সত্যব্রত সমিতির একজন ছিল। ১১ই মার্চ

সুরাট বরোদা ও পেটলাদে যখন গিয়াছিলাম সেখানেও জনসাধারণের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়াছিল। মানুষের প্রাণ লইয়াই আমার সারা জীবনের বেসাতি। আমারও প্রাণ ছাড়া আর কিছু নাই। বিদ্যা-বুদ্ধি ধন-জন কিছুই কোনদিন ছিল না, আজিও নাই। যেখানে গিয়াছি প্রাণ লইয়াই গিয়াছি। কোন মানুষকে 'অন্য' বলিয়া দেখি নাই, কোন ধর্মকে, কোন সমাজকে, কোন সম্প্রদায়কে 'অন্য'-বুদ্ধিতে দেখি নাই। সকলের সঙ্গে ছিল অনন্য বুদ্ধি, একাত্মতার বুদ্ধি, পাট্টা-কবুলিয়তের সম্পর্ক কাহারও সঙ্গে করি নাই। কি বা পর কি বা আপন। যাহাকে যখন পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে one single system-এর যুক্ত হইয়াছি। বুদ্ধির মধ্য দিয়া,

ভেদ দর্শনের মধ্য দিয়া কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক পাতাই নাই। আমি তাহাদের অন্তরে বাহিরে মিশিতাম। এমন প্রাণ লইয়াই আজ আমি একা, বিপন্ন। বুদ্ধি থাকিলে লোক জুটিত। আমার পথ সহজ সরল, কোনও diplomacy আমার নাই। আমি চক্রান্ত করা, দল পাকানো জানি না। অভিসন্ধি না থাকিলে দল হয় না নির্গুণের আবার দল কি? সত্ত্বগুণেও দল হয়, রজোগুণেও হয়, তমোগুণেও হয়। আমি সর্বগুণে আছি অথচ কোন গুণে নাই। তোমার জয় হউক। গুজরাট হইতে আমাকে গুজরাটি ভাষা শিখিবার জন্য বহু ও অভিযান দিয়াছিল আমি সেখানে গিয়া তাহাদের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিব বলিয়া তাহা আর হইল না। রেণু ১০টায় বাহির হইয়া গেল ঘোষ, টি. ডি. কুমার, গাঙ্গুলী ও গর্গ রর ওখানে যায়। ফেরে ৪টার পর। সন্ধ্যার পর অবনী চ্যাটার্জী আসে, গ্রাহক হয়। সে আমার চাত্র প্রশ্ন—বুদ্ধিতে আপনার কথা বুঝি, জীবনে কি করিয়া আনিব? যে মানুষের জীবনে এই ভক্তি realised হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ করা, তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, 'কবে তুমি আমাকে পাইবে' এই প্রার্থনা করা। ইত্যাদি। ৮টায় অমলদেব রায় আসে। আমার জীবনে তো আমি Art ও Morality র সমন্বয় করিয়া চলিয়াছি। ভাব ও রসের, আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় করিয়া চলিয়াছি। প্রতিভা খুব ভোরে অমার ওখানে যায়। মুষ্টির চাউল আনে।.....১০ই মার্চ

ফাল্গুনের 'শনিবারের চিঠি'-তে নারায়ণ চৌধুরীর 'নীতিবাদ ও নেতিবাদ' নামে একটী বেশ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। Setting বেশ হইয়াছে। Life is a compromise. একান্ত আদর্শেও জীবন চলে না, একান্ত বাস্তবেও জীবন চলে না। উহাদের মধ্যে 'রফা' করাই চাই। জড় বা অজড় যাহাকেই একান্ত করিয়া তোলা হয়, 'pushed to extreme' করা হয়, তাহাতেই বিপদ। এই জন্য চাই সমন্বয়। আবার জড়াজড় সমন্বয়কে pushed to the extreme করা হইলে তাহাও অবাস্তব হয়, উহাও আদর্শ পলবাচা হইয়া বাস্তব-বিমুখ হয়। তাই শ্রীনিতাগোপাল অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অসমন্বয়কেও প্রতিপন্ন করিতে হইলে 'মায়া'কে অনন্ত স্বীকার করিতে হয়। আদর্শ বা বাস্তব কেহই কাহাকেও একান্ত ভাবে হজম করিতে পারিবে না। প্রেমের মধ্যেই ইহা সম্ভব। আদর্শ একান্ত হইলে বিশ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। শিল্পীরা এই সমন্বয় করিতে পারেন। ছোটখাট ব্যাপারে 'রফা' করিয়া চলিতেই হয়। মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আদর্শ ঠিক থাকিলে ছোটখাট ব্যাপার আপনা হইতেই অনেকটা আদর্শ-ভাবিত হয়। ছোটখাট লইয়া হুড়াহুড়ি করিলে tension-এর ফলে সব ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেই হইবে। ৭টায় রেণু সহ গড়িয়া বিধান পল্লীতে দুর্গামোহন বাবুর ওখানে যাই ৬নং বাসে। কিছু তরকারী ও বীজ দেন। প্রায় ১০টায় আসি। কিছু পরেই অমরেশ, তাহার স্ত্রী এবং কন্যা কল্পনা ও ২পুত্র আসে। মিষ্টি দেওয়া হয়। অমরেশের স্ত্রী ৪৲টাকা ও কল্পনা ১টাকা প্রণামী দেয়। মধ্যম পুত্র নিখিলেশের কাল উপনয়ন।

চলবে।

কৃষ্ণ-প্রণাম

—শ্রীরেণু মিত্র

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে কংসের কারাগারে কয়েক হাজার বৎসর আগে যে মানুষটি জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন সেই বহু-বন্দিত বহু-নিন্দিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এতদিনেও মানুষ ভুলেও গেল না, বুঝতেও পারল না তাঁকে বুঝি নাই, তাঁকে অনেকে তোলেও নাই—তাই তাঁকে প্রণাম করি, বার বার সহস্রবার প্রণাম করি। তাঁর ইচ্ছায় যদি তাঁকে একটুকুও বুঝতে পারি তাই তাঁকে প্রণাম করি, বার বার সহস্রবার প্রণাম করি।

আমাদের সাধারণ ধারণা যারা বড় সংসারের সব সুযোগ সুবিধা বুঝি তাদেরই ভাগে। তাই দুঃখবেদনার কারণ ঘটলেই নিজেদেরকে আমরা ধিক্কার দেই। আমাদের এ মানসিকতাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করলেন ঐ পচা ভাদ্রের বড় বাদলে দেশের রাজার কারাগারে জন্মে ঐ মানুষটি। শৃঙ্খলিত পিতামাতার কোলে জন্মেই তাঁকে হতে হয়েছিল দূরান্তরে নূতন স্নেহের কোলে সেখানেই কেটেছিল তাঁর কৈশোর, যৌবনও কিছুটা। কারাগারে জন্মানো, জন্মেই পিতামাতার কোল বঞ্চিত হওয়া—আমাদের হলে কত হাহুতাশই না আমরা করতাম কৃষ্ণ কিন্তু কোন দিন হাহুতাশ করেন নি। মানুষ যে যে-কোন অবস্থা থেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং আনন্দিত হতে পারে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন তারই প্রমাণ।

আমাদের মত চারদিকের প্রাচীর ঘেরা ক্ষুদ্র পরিসরে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন শেষ হয় নি—তাঁর জীবন যেমন ব্যাপক বিস্তীর্ণ তেমনি গভীর। আমরা এ ঘটনাটা বুঝতে না পেরে অনেকে তাঁকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছি। বলেছি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ একজন, আর পার্থ সারথী গীতা-বক্তা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ আর একজন। কিন্তু একই মানুষের মধ্যে যে অতখানি গভীরতা ও বিস্তার থাকতে পারে এটা বুঝবার দিন আজ এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে নিয়ে আমরা খই পাচ্ছিলাম না কেন যেহেতু আমরা বিরুদ্ধকে, বিপরীতকে মেলাতে পারি না—কেননা আমরা শিখেছি বিরুদ্ধ কখনও মেলে না। কিন্তু বিজ্ঞানে ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এ কথাটা আজ বোঝা খুব অসম্ভব থেকে যায় নি যে বিপরীত মিলেই একটা সমগ্র বস্তু। বিজ্ঞানী জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলেছেন দার্শনিকেরা একটা বস্তুকে সাদা না কালো, ঠাণ্ডা না গরম, ভাল না মন্দ এই ভাবে স্থির করে বলে দেয়। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানীরা তা বলি না—আমরা বলি একটা বস্তু কতটা ঠাণ্ডা, কতটা গরম, কতটা ভাল, কতটা মন্দ এই ভাবে। তাঁদের এইভাবে বলার কারণ প্রতি বস্তু এই বিপরীত দুটো অবস্থা দিয়েই তৈরী। তাহলেই বিপরীত মিলে মিশেই একটা বস্তু। এইটা বুঝতে পারলে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন বুঝতে আমাদের অসুবিধা থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষ জীবনটাকে সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখেছিল উপনিষদের

যুগে—গীতা ভাগবতেও সেই সমন্বয়েরই ছবি। কিন্তু ভারতবর্ষে আর একটী যে চিন্তাধারা জোরদার হয়ে উঠেছিল, তারা জীবনটাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এই বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে জীবনবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থানে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন'। জীবন সম্বন্ধে বর্ণাশ্রমের এই ঐকদেশিক চিন্তাধারায় শ্রীকৃষ্ণকে বোঝা যাবে না। বর্ণাশ্রমে রয়েছে সিঁড়িভঙ্গ সত্ত্ব রজো তমোগুণকে সে উচ্চনীচ করে তমোকে একেবারে নীচে স্থান দিয়েছে এবং পরম শ্রেয় শুধু সত্ত্বগুণদ্বারাই লভ্য বলে ঘোষণা করেছে। এরই স্বাভাবিক পরিণতি টেনে সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণকে সে উচ্চাসনে বসিয়েছে, তমোগুণী শূদ্রকে একেবারে নীচে স্থান দিয়ে তাকে অন্ত্যজ করে রেখেছে। এইভাবে সমস্ত সমাজটাকে ছোট বড়, কুলীন অন্ত্যজ-এর ভেদবাদ দিয়ে এমন করে বেঁধে ফেলেছে যে সে বাঁধন কেমন করে যে খুলবে দেশ আজও তার সন্ধান পাচ্ছে না। এ চিন্তাধারা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝা যাবে না। তাঁর জীবন-চেতনার কোথায়ও ভেদ-বাদের স্থান নাই—তাই গোপবালকদের কাঁধে উঠেছেন, কাঁধে নিয়েছেন, গরু চড়ানর গোয়ালা জীবন তাঁর কাছে কুরুক্ষেত্রের king-maker-এর জীবনের সঙ্গে সমান লভ্য। যে নারী বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারায় উচ্চতম জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ, আরও স্পষ্ট ভাষায় নরকের দ্বারস্বরূপ, সেই নারীর স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা স্থাপনের জন্য তিনি তাদের কাছে ঘোষণা করলেন 'দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্'। পুরুষের উচ্চ মস্তক—পুরুষ-কৌলীন্যদ্বারা ঠাসা মগজ—শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে নারীর চরণ-তলে। যে বর্ণাশ্রমে 'মনে বনে কোণে' ভগবানকে পেতে হয়, সে বর্ণাশ্রম শ্রীকৃষ্ণের নয়—তিনি কুরুক্ষেত্রে সমাজের অত্যাচারীকে ধ্বংস করার ব্রতে নিযুক্ত। বর্ণাশ্রম এই শ্রীকৃষ্ণকে শুধু অধ্যাত্মবাদের ঠাকুর করে রাখার জন্য সেই ভাবে তাঁর জীবনকে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জীবনের ঠাকুর—তিনি 'অখিলাত্মার আত্মা' আবার তিনিই ব্রজবালকদের বন্ধু, গোপীনীদের পরাণসখা, রাষ্ট্র-শক্তিদ্বারা নিপীড়িত দ্রৌপদীর রক্ষাকর্তা, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধদ্বারা অত্যাচারীর হাত থেকে রাজত্ব নেওয়ার জন্য অর্জুনের প্রেরণা-দাতা। কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে মার্কামারা হেয় উপাদেয় নয়। তিনি সত্ত্বগুণদ্বারাই লভ্য এ কথা তিনি বলেন নি কোথাও—বললেন, 'যং করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্।'—এই যৎ শব্দদ্বারা যে কোন বৃত্তি, যে কোন গুণ বুঝায়—তমো গুণ থেকে রজোগুণ বড়, রজো থেকে সত্ত্ব বড়—এবং তাই দ্বারা তিনি লভ্য—এ বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন,

'রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মসংযোবিশ্লেষাত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি —আসক্তি ও বিদ্বেষ-বিমুক্ত আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় বিচরণ করলে তা প্রসাদে পরিণত হয়—সে বিষয় বিষ হয় না। বিষয় মাত্রই বিষ নয়, হেয় নয়—কোন কিছুই চিরকালীন নির্দিষ্ট ভাবে হেয় উপাদেয় বলে স্থিরীকৃত হয়ে নেই। আমি কেমন করে কি মন নিয়ে তা ব্যবহার করব তারই উপরে হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বস্তুকে—বস্তু বলতে মানুষ ঘটনা সব কিছু—তার নিজস্ব মূল্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন—তাই বস্তু তাঁর কাছে বিষ হয়ে ওঠে নি—প্রসাদই হয়েছে। কৃষ্ণ যেমন করে জীবনকে দেখেছেন, ব্যবহার করেছেন সেটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি বলেই তাঁকে বুঝি না। ভেদবাদদ্বারা, আসক্তি-বিদ্বেষ দ্বারা আমাদের চিত্ত এতই আচ্ছন্ন যে বস্তু তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আমাদের কাছে পায় না—তাই বস্তু আমাদের পরাজিত করে। তাই ধন যশ প্রতিপত্তি ভোগ করি বটে আমরা, কিন্তু তাদের কাছে আমরা পরাজিত, তাই শান্তি আমরা পাই না, আনন্দ তো দূরের কথা। বস্তুকে আমরা 'আমার' করে ফেলতে চাই—কিন্তু বস্তু কখনও কারো অধীন হয় না। আমরা বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা-দ্বারা বিশ্বসেবা বুদ্ধিতে জীবন চালাই না অথচ একাত্মতা ব্যতীত জীবনে আনন্দ লাভের আশা নেই, এবং বিশ্ব সেবাবুদ্ধি ব্যতীত সে আনন্দে ব্যাপকতা নেই। উচ্চ বা নীচ কৃষ্ণ-জীবনের অভিধানে এ দুটি শব্দ নেই যেমন, তেমনি কারো-কেই—বস্তু ঘটনা মানুষ—তাঁর 'অধীন' করবার মানসিকতাও তাতে নেই—অথচ আমরা এই দুই মানসিকতাদ্বারা আচ্ছন্ন—তাই তাঁকে বুঝি না। আমরা স্বল্পাধার—তাই তাঁর ব্যাপকতা ও গভীরতা ধারণা করতে পারি না তাই তাঁকে ভাগ ভাগ করে নেই, কিংবা নিজে যতটুকু বুঝি ততটুকু নেই। আমরা নিজেদের মত করে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা না করে যদি তাঁর মত করে তাঁকে বুঝবার মন রাখি তাহলে খানিকটা বুঝতে পারব। শ্রীকৃষ্ণ একটি মুক্ত জীবন-ধারা—একটি প্রাণধারা যে প্রাণ বায়োলজিক্যালি এবং সাইকোলজিক্যালি শ্রেষ্ঠ, যে প্রাণে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাল মন্দ সকলের স্থান আছে, যে প্রাণ বিপরীত বিরুদ্ধের সমন্বয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ মহান, শ্রীকৃষ্ণ সকলের আপনজন—তাই তাঁকে ভোলাও যায় নি, বোঝাও যায় নি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে তাঁর জন্মসময়ে তাঁকে স্মরণ করি, প্রণাম করি—সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি যার জীবনে বিদ্যা, জ্ঞান কৌলীন্য, অর্থ প্রতিপত্তি কিংবা যা কিছুই হোক না কেন কেন্দ্রীভূত হতে পারে নি, কেন্দ্রীভূত হয়ে অপরের অত্যাচারের হাতিয়ার হয় নি। সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি অপরের অধিকার স্থান ও মর্যাদা যাঁর জীবনে স্বীকৃত। সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি যিনি ব্যক্তি নন, যিনি গোগোপসঙ্ঘাবৃত—সঙ্ঘচেতনা যাঁর জীবন-চেতনার গোড়াতে। এ সঙ্ঘ-চেতনা কোন বিশেষ পরিবার গোষ্ঠী দল বা দেশ-চেতনা নয়—এ একটা সামগ্রিক বিশ্ব-চেতনা আজকের দিনে যা দরকার। বিশেষ বিশেষ মানসিকতা দিয়ে আজকের বিশ্বের সমস্যার সমাধান করা যাবে না—আজ দরকার সামগ্রিকতার চেতনা—সবাই মিলে আমরা একটি মানব গোষ্ঠী প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েও। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের

নিজস্ব স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই যে নির্বিশেষের খোঁজ পাওয়া যাবে আজকের দিনে সেই নির্বিশেষকে দরকার—কোন বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করে নয়। প্রতি বৈশিষ্ট্যের মর্যাদাদাতা-কারী কৃষ্ণকে প্রণাম করি যাতে আমরা বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিতে পারি। কৃষ্ণকে শুধু আধ্যাত্মিকতার ঠাকুর করে রেখে জাতীয় জীবনে যে ক্ষতি দিয়েছি হাজার হাজার বৎসর ধরে, আজও তা শোধরাতে পারব যদি কৃষ্ণের এই সামগ্রিক জীবন চেতনাকে ধরতে পারি। 'সমগ্র মানুষ' কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

শিবাজী স্মরণে

—শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা

স্মরণে রোমাঞ্চ লাগে দীর্ঘ তিন শতাব্দীর শেষে
সেই মহা অভিষেক সহ্যাদ্রির সানুদেশ পরে
শিবাজীর, হয়তো বা মহারাজ কিম্বা শুধু মুক্তির সৈনিক,
আমাদের অন্তরীক্ষে আজও শোভে যাঁহার গৈরিক।

আমরা শুধুই ভাবি সহ্যাদ্রির কন্দরে কন্দরে
সে দিন যে ইতিহাস গড়েছিল সে কি উপকথা!
ভাবি আর মুগ্ধ হই শতাব্দীর বিস্মৃতির ছাই
একান্ত আগ্রহ ভরে ক্ষণে ক্ষণে যখনি উড়াই।

উড়ে উড়ে ধ্বজাশীর্ষে ত্যাগমন্ত্রে মণ্ডিত গৈরিক,
নিম্নে ওই রক্তমাখা পক্ষহীনা ভারত-জননী,
স্বজাতীয় চেতনার অবক্ষয়ে আচ্ছন্ন জনতা,
কে শোনাবে তাহাদেরে অগ্নিস্রাবী ভোমার বারতা!

এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বন্ধনের যে শপথ সে দিনের অপূর্ণ আজিও
আবার নূতন করে গ্রহণের এসেছে কি দিন?
তাহার উত্তর দেবে ইতিহাস, সে যে ক্ষমাহীন।

॥ এক একটা দিন আসে ॥

—শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

এক একটা দিন আসে বড় ভয়ানক
যেন রুদ্ধ ক্রন্দনক
ভিক্ষে করে নিয়ে যায়—সমস্ত আকাশ।
এসন্ন আত্মীয় অন্ধকার
বাসা বাঁধে বুকের ভিতরে;
আমি কম্পমান
অনিরুদ্ধ প্রত্যাশার কাছে
জীবনের মানে খুঁজি। সারা দেহ জুড়ে
পুড়ে যায়। তবু এক অতন্দ্র বিশ্বাস
আঁধারে ঘুমিয়ে থাকে। পাপড়ির আড়ালে
অপরূপ গন্ধের মতন।

* * *

স্বাক্ষর করেছি আমি নিজের মরণ
নিজ হাতে বার বার, তবু দেখি অন্তিম ভালে
একটি আরক্ত ফুঁড়ি—তখন আশ্চর্য ফুটে আছে।
নতুন আবেগে দীপ্ত জেগে উঠি, দাঁড়া হই
আর এক স্বর্ণস্বর দিনের আশ্বাসে।
• • • বিকেলের আগেই নম্র ফুঁড়ি ঝরে যায়।
তবু অশ্রু প্রতিশ্রুতি আমাকে জাগায়
নতুন আলোর দিকে। শিকড়ের মত আলবালে
জল ঢালি—নতুন আবেগে:
বিশুদ্ধ বিবেকে
বার বার জীবনের অর্ঘ্য রচনা
করিতেছি আমি আহা। • • •

. . . অপার্থিব আলোকের কণা
কুড়িয়ে ফিরেছি আমি, অন্য এক দেবোত্তর দিনের সূচনা
আমাকে ঘটাতে হবে—এই ভেবে। . . . . . .
. . . এবং আশ্চর্য দিন ফিরে আসে
স্বর্ণপ্রভ স্বচ্ছ দিন। কিন্তু চেয়ে দেখি
এ কি! সব তার মেকী!
যা চেয়েছি—সে তো এ দিনের পদ্ম নয়।
সমস্ত আকাশ যেন নীল পরাজয়!
প্রতিশ্রুত আলো যেন শূন্যতায় স্তব্ধ হয়ে আছে
আকাশের সারা দেহে—এ বড় বিস্ময়!
মৃত্যুর তমিস্রা নামে আকাশের প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
জীবন আসলে দীর্ঘ শেষহীন নাটকের পালা,
কিশোর প্রদীপ তবু জ্বালা
রয়েছে বুকের মধ্যে। বৃদ্ধ প্রীষ্ট আসে।

আবির রঙে আমার কৌতূহল ॥ —শ্রী গণেশ চক্রবর্তী

আগামী দিনের উল্টোপিঠে
আমি ছিলাম একগুচ্ছ অতসী
উদাসী—উন্মুখ।
ভানাকাপটানো প্রজাপতির আবিররঙে
আমার কৌতূহল—কৌতূহল
একটানা ঘুনঘুনিয়া পাখীর উড়ন্ত ঢেউ
নীড়হারা বাঁধাহারা দিশাহীন।
বিগত ভবিষ্যতের সীমানায়
প্রথম সূর্যের শান্তরক্তা বিস্ফুরণ।
রক্তে রক্তে সিঁদুর রাঙা আমার বিগত ভবিষ্যৎ।
এক মুঠো আকাশ, ঘেরাটোপ,
দে দোল্ দোল্।
চলতি পথে অলিখিত নির্দ্দেশ
কচি ঘাসের সবুজ অক্ষর।
অবকাশ—অবকাশ—অখণ্ড অবকাশ
নির্জ্জিব নৈরাশ্য। ভবিষ্যৎ
অস্তসূর্যের শেষ আভায়
ঝরা রেণু বেণুবন।
ভানাকাপটানো প্রজাপতির আবিররঙে
আমার কৌতূহল—কৌতূহল
বৈশাখের মধ্যদিনের দিগন্ত।

যোগী বরদাচরণ

— শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ।

আমাদের বঙ্গভূমির মৃত্তিকা অতি পূত পবিত্র। ···এখানে বহু দেবদূতের আনাগোনা হয়েছে কালে কালে। শ্রীচৈতন্য-চরণে ধন্য হয়েছে এর ধূসর ধূলি। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়-কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল এঁরাও জ্বেলে দিয়ে-ছেন আমাদের হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে দিব্য-জ্যোতির অমৃত প্রদীপ। কালের সোপান বেয়ে নেমে এসেছেন শ্রীবরদাচরণ। জড়তার পাষাণ ফলকে আবার বুঝি প্রকর্ষ হয়েছে জ্যোতির্ছটা। বরদাচরণ একাধারে যেমন সিদ্ধ সাধক, অন্য দিকে তেমনি নির্ভীক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দরিদ্রদরদী, প্রাজ্ঞ—সর্ব্বোপরি আদর্শ শিক্ষকরূপে জন মানসে সেদিন সুবিদিত। কবিকুলোত্তম কালিদাসের ভাষায় তাই তো বলতে বাসনা জাগে—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥

সিদ্ধসাধকদের অবতরণ ক্ষণে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এ যোগীর জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর জীবন-খাতার প্রথম পাতা খুলে ধরি—১২৯৩ সালের ১৬ই শ্রাবণ। বরণমুখর সন্ধ্যা। মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘন্টা। ভাগীরথী দেবীর ক্রোড়ে আসে এক দেব-শিশু। অরুণোদয়ের সূর্য্যের মত আঁতুর ঘরে বিকিরিত হয় আলোর রোশনাই। কনকবরণ শিশু দেখে জনক দক্ষিণাচরণ চমকে থমকে দাঁড়ান। প্রতিবেশীদের প্রাণে জাগে জিজ্ঞাসা—কাঞ্চনতলায় কে এল এই কাঞ্চনময় শিশু?

চম্পক শোন কুসুমকনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণিরে।
হৈত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙনীরে।

চন্দ্রলেখার ন্যায় দিনে দিনে বাড়তে থাকে দেবশিশু। আট বছরে হয় উপনয়ন। রাত্রে নিদ্রিত কিশোর কুমার। হঠাৎ ঘর আলোয় আলোময়। অপলক নয়নে কি দেখে বালক? রজতনির্ম্মিত এক শিবলিঙ্গ! চোখ মেলাতেই সম্মুখে হাজির স্বয়ং শিব। বালকের কাছে এসে কানে কানে কি যেন কথা বলেন দেবাদিদেব। সেই পুণ্য বিভাবরীতেই দীক্ষা হয় কিশোর বরদাচরণের।

ঋষি অরবিন্দ যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন "Greatest yogi of modern Bengal, আমি এবার তাঁর জীবন-নাট্যের যোগ-লীলা অঙ্কের দুটি দৃশ্য দেখাই। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ধ্যানের দেবতা বরদাচরণ। হঠাৎ কবির আদরের দুলাল বুলবুল দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে যায়। আকুল হন নজরুল। বেদন বাধার রিক্ত রোদন শুরুর কর্ণগোচর হয়। পুত্র দর্শনের আশ্বাস দেন গুরু। একদিন উপাসনা কক্ষে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপে রত

কাজি কবি। ধ্যান ভাঙলে কি দেখেন কবি? দেখেন তাঁর নয়নমণি বুলবুল পা টিপে টিপে ঘরে আসে। খোলে আলমারি। খেলনাগুলো কয়েক মিনিট নাড়ে। পিতার পানে পরিচিত হাসি হেসে বুলবুল উড়ে যায়।

নিমন্ত্রিতা পল্লীতে নাটকার ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে আসেন এক অভিনেতা ও ডাক্তার বন্ধু. তখন নিমতিতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরদাবাবু। নাটকার বন্ধুদের কাছে বরদাবাবুর ঐশী শক্তির কথা উল্লেখ করেন। নটবন্ধু মন্তব্য করেন—"Monks are smart and full of tricks"। বিদ্যাবিনোদ মশায় তখন বরদাবাবুকে সাধুর সিদ্ধাই কিছু দেখানোর অনুরোধ জানান যোগীবরের আননে তখন ফুটে ওঠে এক অলৌকিক দ্যুতি। তিনি অভিনেতাটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"কয়দিন আগে তরুণ অভিনেত্রীর সঙ্গে নির্জন কক্ষের ঘটনাটাই প্রথমে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরি!....." অভিনেতার আননে তখন দেখা যায় একরাশ কালি। ডাক্তারের দিকে দৃষ্টি দেন এবার দিব্য পুরুষ। নটবন্ধুর অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু আরোও আতঙ্কিত হন। লজ্জায় তখন তিনি জ্যোতির্ময় পুরুষের পদপ্রান্তে পতিত হন। যোগীবর তখন সেক্সপীয়রের কথা উল্লেখ করে বলেন—"There are more things in Heaven and Earth than your philosophy could dream of ....." আত্মদহনের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকেন তখন বিদ্যাবিনোদ মশায়ের বন্ধুদ্বয়। তাঁরা ভাবেন কোথা থেকে পেলেন সাধারণ এক শিক্ষক এ ঐশীশক্তি? এ জিজ্ঞাসার জবাব ভগবান নিজেই উদ্ধবকে দিয়াছেন—

যং কর্মভির্যং তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥

এবার যোগীবরের জীবন-ইতিহাসের নির্লোভতার পৃষ্ঠায় আসি—বরদাবাবু সে সময় লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। আত্মভোলা যোগীর যোগবিভূতির সৌরভ তখন দেশ বিদেশে বিকীর্ণ। সে সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে সবদ্বীপ থেকে আসেন ডাঃ সোয়েটামা। দুজনের মধ্যে হয় অধ্যাত্ম আলোচনা। বরদাবাবুর প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হন সোয়েটামা। তিনি সবদ্বীপের Spiritual Teacher হওয়ার আমন্ত্রণ জানান লালগোলার আচার্যকে। কিন্তু নির্লোভ বরদাবাবু অঢেল অর্থাগমের প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখান করেন।

যোগীর যোগবিভূতির বার্তা ইথার তরঙ্গে ভেসে চলে। প্রচারিত হয় প্রতীচ্যের প্রতি রাজ্যে। মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় মার্কিন থেকে আসেন ডাঃ জারা। লালগোলার পাশের পল্লীতে হয় এক মহতী ধর্ম সভা। বরদাবাবুর অধ্যাত্মমার্গের অমৃত ভাষণে বিমোহিত হন মার্কিন দার্শনিক। অধ্যাত্মধর্মের প্রচারকের গৌরবময় পদ দিতে চান ডাঃ জারা। কিন্তু মার্কিন স্বর্ণমুদ্রাতেও সিদ্ধ সাধকের মন দ্রব হয় না। তাই তো ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—

অরূপ রতন লভেছেন যিনি ধ্যানে বসে নিজ কক্ষে;
থাকুন সে তো কাচের তুল্য সে কি পরে তাঁর লক্ষ্যে।

এবার জ্যোতির্ময় পুরুষের দৃঢ় সঙ্কল্পের ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিবেশন করি—বরদাবাবু সে সময় লালগোলা যোগীন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বাংলার আকাশ বাতাস তখন যোগী-

বারের যশোরেখুতে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ হয় কয়েকজন সহকর্মীর। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধান শিক্ষকের কর্মের উদাসীনতার অভিযোগ আনেন। সে কথায় বাধা লাগে বরদাবাবুর বুকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক সমীপে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহু অনুরোধ উপরোধ করে। কিন্তু যোগীবর থাকেন অটল। জঙ্গীপুর মহকুমায় বাড়ালা রামদাস সেন হাইস্কুলে হেডটরের পদ বরণ করে লালগোলা ত্যাগ করেন।

বরদাবাবু সত্যই ছিলেন দরিদ্র দরদী। একবার এক ভিখারী শতছিন্ন বস্ত্র পরে বরদাবাবুর দ্বারে ভিক্ষা-প্রার্থী হয়। বাক্স থেকে একখানি নির্খুত বস্ত্র ও একটি মুদ্রা ভিখারীর হস্তে প্রদান করেন। কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতা একদিন বরদাবাবুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রায় একশত টাকা এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে একশত টাকা তুলে নিজের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একুনে প্রায় দুশ পঞ্চাশ টাকা লোকটির হস্তে তুলে দেন। লোকটি ছলছল চোখে পায়ের ধূলি নিয়ে চলে যায়। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের তিনি পুস্তকদান, সময় সময় পকেট থেকে অর্থদানও করতেন। যোগীবরের হোমিও চিকিৎসাতেও বেশ দক্ষতা ছিল। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত তিনি নিঃস্ব দুঃস্থ রোগীদের ঔষধ দান করতেন। কখনো কখনো পথ্যের জন্য তাঁকে কিছু কিছু পয়সাও দিতে হত।

যোগসংসিদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞার কি পরিসীমা আছে? তাঁর অতলান্ত গভীর জ্ঞান-সমুদ্রের তল তাঃ জারা, তাঃ সোরেটামাই তো পাননি। তাই তাঁর প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে গীতার ভগবানের বাণী সার্থক রূপদান করে।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

আদর্শ শিক্ষকের এবার কিঞ্চিৎ পরিচিতি তুলে ধরি। ১৯১৪ সালের কথা। লালগোলা হাইস্কুলে পুরস্কার বিতরণ হবে। রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ বরদাবাবুকে অনুরোধ জানান স্যার আশুতোষকে সভাপতিরূপে আনার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে লালগোলার আচার্যের হয় পত্র বিনিময়। আসার প্রতিশ্রুতি দেন স্যার আশুতোষ। বাংলার বাঘের আগমনের বার্তা পেয়ে লালগোলায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। যথা সময়ে মাল্য বিভূষিত কুতনাথতুল্য আশুতোষ চন্দন-চর্চিত ললাটে সভাপতির আসনে সমাসীন হন। যথারীতি পুরোহিতের পুরোভাগে দাঁড়ান প্রধান শিক্ষক। শুরু হয় তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। সে ভাষণে উপাচার্য মশায় আত্মহারা হয়ে স্বীয় কণ্ঠমালা বরদাবাবুর গৌরগলায় পরিয়ে দেন। কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেন—"বরদাবাবুর মত কৃতবিদ্য জাত শিক্ষকের দ্বারাই কেবল দেশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি পেতে পারে।" তখন রাজা রাও দ্রুত এসে তাঁর মাথার শিরোপা উপাচার্যের চরণে রেখে লালগোলার আচার্যকে আলিঙ্গন করেন। দশ দিকে সাধু সাধু ধ্বনি উত্থিত হয়। স্যার আশুতোষের কণ্ঠমালা সে তো হীরের হার! আদর্শ শিক্ষকের এর থেকে কি অমূল্য পুরস্কার হতে পারে!

পরিশেষে উল্লেখ করি আন্তর্জাতিক খ্যাতি-

সম্পদ এই জ্যোতির্ময় পুরুষের আমি সাক্ষাৎ পাই। তিন বছরের ঐ বোধি বৃক্ষের শীতল স্নেহ-ছায়ায় আমি আশ্রয় লাভ করি। তাঁর পাদপীঠে বসে পান করি জ্ঞানামৃত। বাংলার চাপলো সে দিন চিনেও চিনতে পারিনি চিন্ময় পুরুষকে। আমার হৃদয় বীণায় তাই আজ বার বার বেহাগ রাগিনী বাজে—

স্পর্শমণি কাছে পেয়েও হারিয়েছি হায় কপাল দোষে;
অনুতাপ অনলে আজি দগ্ধ হই তাই তাই বসে বসে।
সপ্তর্ষির দর্শনের পাশেই তোমার আসন জানি;
দিয়ে শুরু। চরণ-রেণু ধন্য কর এ জীবনখানি।

মা

—শ্রীসুনীতি সান্যাল

মাকে মনে পড়ে,—বাংলার শরৎ ঋতু সবার কানে কানে যেন বলে দেয় মা আসছেন! শরতের আকাশ নীল শাড়িতে নীলাম্বরী সাজে মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করে। ধরণীর মাটি সবুজ আঁচল বিছিয়ে দেয় যাকে আবাহন করবে বলে এমনি করে দৈনন্দিন ছোটখাট কত ঘটনাকে পেরিয়েও বছরে এমন একটা দিন আসে যখন জড়া প্রকৃতি থেকে সুরু করে সবার প্রাণে প্রাণে বিশ্ব মায়ের কথা বেজে ওঠে। কবি পাইলেন —"পূজার গন্ধ আসে যে ভাই মায়ের গন্ধ হয়ে'। তাই শরৎ ঋতুর বাতাসে মায়ের গন্ধ আমরা পাই বলে সবাই মিলে মিশে ঘটা করে জাঁকিয়ে তুলি মায়ের আগমন অনুষ্ঠানটী।

ছোট্ট শিশুর মতো যখন আমরা থাকি তখন দেখি আমার মা আমাকে ভালবাসেন, তোমার মা তোমাকে ভালবাসেন, তোমারই মঙ্গল চিন্তায় ব্যাপৃতা থাকেন—এতে আমাদের মধ্যে যে বিরাট সত্তাটি সুপ্ত আছে তা কিন্তু তৃপ্ত হয় না। তাই বাইরে সকলের সাথে বিরাট সত্তার পরিচয় লাভের প্রয়াস আমাদের ভেতর থেকে চির কাল নাড়া দেয়। তাই বিশ্বরূপিনী বিশ্ব-ব্যাপিনী মায়ের অনুধ্যানে সকলের প্রাণ মেতে ওঠে। বিশেষ একটা কালকে, বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে সকলে এসে মায়ের কাছে দাঁড়াই, সকলের আবিহারিণী দেবী শ্রীশ্রী দুর্গাকে প্রণত হয়ে উচ্চারণ করি—

'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।
অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥'

বিশ্ব-শক্তির হেতু-ভূতা মায়ের এই বিরাট রূপের কাছে আমরা ক্ষুদ্র জীব দাঁড়াই কোন্

করুণাময়? হয়তো যে সত্যিই আছে। কেননা, মা যে আমার, তোমার সকলকে ভালবাসেন। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে প্রতিটী জীবকে তার তার মত করে রক্ষা করবার জন্য মায়ের অনন্ত অপার স্নেহ-দৃষ্টি প্রসারিত। তাই তো এই মায়ের পূজায় নেচে ওঠে বিশ্ব প্রকৃতি, নেচে ওঠে সর্ব্ব স্তরের সর্ব্ব অবস্থার মানুষের মন প্রাণ।

কত যুগ যুগ ধরে মায়ের পূজা চলে আসছে। সকলদেব-শরীরে এই দুর্গাশক্তিই ভারতবাসীর উপাস্যা দেবী। মা আমার বরাভয়দায়িনী, অসুর-নাশিনী। সুখে দুঃখে পরস্পর সংবদ্ধ জীবনে আসুরিক বৃত্তির নাশ করে অভয় আর আনন্দ লাভ করতে পারি মায়ের এই রূপের পূজায়। রাজা সুরথ, সমাধি বৈশ্য রাজা থেকে বিতাড়িত হয়ে দুরবস্থায় মায়ার বন্ধনে মনস্তাপে জর্জরিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন মেধস মুনির জীবনে দুঃখ হয়ে মায়ের সৃষ্টি-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করে জীবন-জিজ্ঞাসার বাস্তব পরমার্থ জানতে পেরেছিলেন, তখন তাঁরা অভয় হয়েছিলেন, হয়েছিলেন দিব্য আনন্দে আনন্দিত।

মায়ের এই পূজার গোড়ার ইতিহাসে পাই বিশ্ব প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নতুন সৃষ্টির জন্য উপস্থাপিত। কিন্তু মধু ও কৈটভ রূপী, অতীতের কাল মল সংস্কার তাঁকে বাধা দিচ্ছে নতুন সৃষ্টিকর্মে পদক্ষেপনে। দৈব বাণী শুনলেন তিনি। তিনি নিদ্রিত বিষ্ণুকে—আত্মাকে—লাভ করবার জন্য বিষ্ণুর নাভি-কমলের গভীর অন্ধকারে তপস্যায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। তপস্যার ভেতর দিয়ে কেটে গেল তাঁর নতুন সৃষ্টি পথে বাধা-দানকারী সব-সংস্কার। সৃষ্টির নতুন প্রভাত শুরু হল। পূজার তিন দিনে মহা-সপ্তমী তিথিতে আমরা পূজার এই তত্ত্ব পাই যে নতুন করে সংস্কার মুক্ত হয়ে ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, নতুন রাষ্ট্র জীবন কোন্ আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে তুলব তারই উপস্থাপনা ছন্দ। মানুষের ব্যক্তি-জীবনে আত্মশুদ্ধি লাভ করে সকল সম্ভবনাকে কী করে বাস্তবায়িত করা তা জানব মহা পূজায় মহাকালী রূপের সাধনা করে। এ সাধনায় চাই নিজের ভেতরের অহঙ্কারকে গলিয়ে দিয়ে শুদ্ধ জীবন লাভ করা আর মাকে জীবনে বরণ করবার সত্য সংকল্প।

নতুন সৃষ্ট বিশ্বে কেমন করে সুসংবদ্ধ হয়ে থাকব তা শিখব মহাষ্টমীর দিনে বিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি মহিষাসুররূপী আসুরিক বৃত্তিকে নাশ করে, মায়ের মহালক্ষ্মী রূপের চরণে প্রণত হয়ে। মহা-নবমীর দিনে শিখব সৃষ্ট বিশ্বের সব কিছুকে কেমন করে সর্ব্ব জীবের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়—কেমন করে ত্যাগের দ্বারা ভোগের আনন্দ লাভ করা যায়; এমন ভোগবাদী শুম্ভ নিশুম্ভ অসুররূপী বৃত্তিকে নাশ করা যায় তারই তত্ত্ব। এমনি করে মায়ের এই বিরাট পূজার তত্ত্বকে জীবনে অধিগত করতে পারলেই বিশ্বে আসবে সত্যিকারের কল্যাণ, তখনই হবে সর্ব্বক্ষেত্রে বিজয়ের আনন্দোৎসব সার্থক।

কিন্তু কোন্ সুদূর অতীত কাল থেকে মায়ের এই বিরাট রূপের বিরাট তত্ত্বের পূজা করেও আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, আলোর রোশনাই-এর ত্রুটী নেই, মাইক্রোফোনে দেবী দুর্গার সম্বন্ধে প্রতি মণ্ডপ থেকে হিন্দীগানের

কান-ফাটানো শব্দের বিরতি নেই বিকৃত আনন্দ আস্বাদনের অনুষ্ঠানে কোন উপকরণই বুঝি বাদ যায় না। অবশ্য কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে এ সবের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং তাতে স্বস্তিও একটু মেলে। তাই পূজার দিন কয়টিতে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা কয়টি মনে পড়ে যায়—'সবই আছে নেইকো শুধু রথের ঠাকুর রথে'। বছরে বছরে শারদীয়া পূজায় বিশ্ব-জননী পূজিতা হন কিন্তু যে ছন্দে পূজা করলে সত্যিকারের পূজা হয়, পূজার ফলে যে সিদ্ধি মানুষের জীবনে নেমে আসে সে ছন্দটী আমরা ভুলে গেছি। কিংবা আমাদের জীবনে ধরাই পড়েনি। ইংরেজ দেশ থেকে চলে গেছে দীর্ঘ দিন—দেশকে নতুন করে, মানুষের স্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব এখন দেশবাসীরই হাতে। কিন্তু আজও দুবেলা পেট পুরে অন্ন সংস্থানের সম ব্যবস্থা হয় নি অথচ বৎসরে বৎসরে আমরা 'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা' মায়ের পূজায় ব্রতী হই। আজও অস্পৃশ্যতার পাপের বোঝা সানন্দে পৃষ্ঠে বহন করে মানবাত্মাকে 'হরিজন' বলে নিগৃহীত করতে এতটুকু সংকোচ বা লজ্জা বোধ করি না অথচ 'যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা' মায়ের পূজায় ব্রতী হই। তার কারণই হচ্ছে পূজার আসল উদ্দেশ্যই আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধ হয় নি এ-যাবৎ। শাস্ত্রে আছে 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'—দেবতা হয়ে দেবতার পূজা —এ কি আমরা বুঝতে শিখেছি? বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কি আমরা মায়ের পূজায় ব্রতী হই? সকলের আত্তিহারিণী দেবী পূজায় কি আমাদের সকলের সঙ্গে সুখে দুঃখে সমভাগী হবার প্রকৃতি জাগ্রত হয়েছে? হয় নি। তাই যুগ যুগ ধরে মায়ের পূজা করেও জাতীয় জীবনে আজও বিজয়ার অনুষ্ঠান সার্থক হল না। সব কিছু অনুষ্ঠানই জীবনের বাইরেই রয়ে গেল।

কিন্তু তবু প্রার্থনা করব, অনন্ত জীবন দিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাব আমরা শুদ্ধ হব, সংঘবদ্ধ হব, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ে জীবন যাপন করব। আদি মানব ব্রহ্মা যে তপস্যাদ্বারা মাকে জীবনে জাগ্রত করেছিলেন, আমরাও তেমন তপস্যা করে জাতির জীবনে মায়ের আসন প্রতিষ্ঠা করব।

"আমাদের ইতিহাসে এই রকম (অর্থাৎ জাতি ভেদ প্রথার ওপর আঘাত হিন্দুসমাজের সহ্য না করা) বারবারই হয়েছে। বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। বুদ্ধ থেকে মার্ক্স অবধি অনেকেরই তাকেই মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারপর বিশাল সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বিরোধীরা ধীরে ধীরে নেমে এসেছেন নব লব্ধ সত্যের ঊর্দ্ধলোক থেকে প্রচলিত আচারের কঠিন মাটিতে। বিদ্রোহী মন্ত্র বা আওয়াজ ত্যাগ না করেও তাঁরা জীবনের আচরণে আপোস করে নিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে"। —শ্রীজ্ঞান দত্ত—ব্যক্তি মুক্তি সমাজ।

ডিসেম্বর আসুক

—শ্রীঅখিল রায়

একটু আগে বড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। সারা কলকাতা ডুবে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পূর্ববাংলার কোনও বিল মুঁকে একটা বিরাট শহরকে ঘিরে আছে বিরাটাকার গর্ত দিয়ে গল গল করে জল গড়াচ্ছে।

বোঝা দুষ্কর, এটা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা একটা ঝকঝকে শহর কোথায় বা এর সেই চওড়া চওড়া রাস্তা, ফুলের কেয়ারী, কৃত্রিম ঝর্ণার বারিধারা আর আমোদ উদ্যান? সমস্ত কিছুই জল ও ঝড়ের দাপটে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাম, সাধারণ বাস, লাক্সারী বাস কিংবা মিনিবাস আর চলাচল করছে না। কেবল রিক্সার ঠুং ঠাং আওয়াজ। খালি পায়ে এক হাঁটু জলের মধ্যে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুধু ওরাই কাউকে কাউকে সওয়ারী করে বাড়তি দু'পয়সা কামানোর চেষ্টায় ছুটছে। সাময়িক এ বিপত্তিতেও ওরা অবিচল। ট্রামগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ক্বচিৎ দু'একটা বাস আচমকা জলের মধ্যেই হুঁশা এক পা করে এগোচ্ছে।

একটা দু'তলা বাসে চুপচাপ বসেছিল নীলাদ্রি। চুপচাপ বললে ভুল বলা হয়। দার্শনিকের মতো এদিক ওদিক ও দেখছিল। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে তখনও তাদেরকে নিয়ে কেমন এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠে প্রকৃতি কখনও কখনও সে কথাই বোধ হয় ভাবছিল ও।

নীলাদ্রি যাচ্ছিল যাদবপুর। ওদের একটা ঘরোয়া মিটিং ওখানে সামান্য একজন স্কুল মাস্টার কী করে যে অমন কুলে কেঁপে উঠতে পারে তা শেখর গাঙ্গুলীকে না দেখলে নীলাদ্রি জানতেই পারতো না।

শেখরই এনেছে ওকে এই পথে সামান্য অবস্থার শেখর গাঙ্গুলী আজ বিরাট। ওর বসার ঘর যেখানে ওদের মিটিং বসে, দখার মতো। চেয়ার, সোফা, আলমারী, বা পর্দার দিকে চোখ পড়লেই ওর জীবনে ওঠার একটা সুস্পষ্ট আভাস মেলে।

নীলাদ্রিদের কাছে শেখর গাঙ্গুলী দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওর ঐ ঐশ্বর্যালো ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রিদের মতো কর্মীরা চনমনিয়ে ওঠে।

চেষ্টায় কী না হয়!

বের হবার মুখে আকাশটা দেখেই নীলাদ্রিকে বারণ করেছিল বেরুতে অম্পা। টপবগ করে যখন ওর স্কুটারটা উঠানামা করছে একটু উপরে উঠার জন্য তখন ঐ রকম মেতিয়ে যাওয়া কথা টথা ওর ভাল লাগে না।

বেরুবে যখন ঠিক করেছে তখন বেরুবেই। বিশেষ করে এ রকম ঘরোয়া এসেম্বলীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ নিয়ে আলোচনা হয়।

নানা রকম সাজেশন্স, কিংবা গাইডেন্স

দেওয়ার জন্যে ডেকে পাঠায় শেখর গাঙ্গুলী নীলাদ্রিদের। ওরা আসে সবাই। সবাই মানে অরিন্দম সোম, কল্যাণ গুহ, মাধবী সেন কি বা রীতা ঘোষ। কেউ ফিল্ড অফিসার, আর কেউ বা এখনও শুধু এজেন্ট

ভবিষ্যতে ফিল্ড অফিসার থেকে ওরাও ধাপে ধাপে উঠবে। যে যেমন কেস্ দেবে তেমনি তার উন্নতি। উন্নতির আশাও উজ্জ্বল।

সেভিংস সম্বন্ধে আজকাল সবাইই সচেতন।

প্রত্যেকেই এখন চায় এক একটা খুদে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক হতে।

নীলাদ্রির চোখের সামনে অনেকের ছবিই ভেসে উঠে মাঝে মাঝে যখন এ রকম পরিস্থিতিতে আটকে যায় কোথায় ও।

অনেককে ছাপিয়ে যে মুখটা জ্বলজ্বল করছিল সেদিন সে মুখটা অরিজিতের ওর ছোটবেলার বন্ধু।

বেচারা!

কেমন যেন একটু দুঃখ হয় অরিজিতের জন্যে। নীলাদ্রিরও অনেক ছোট ছোট দুঃখ, ছোট ছোট অনেক অসাফল্য। তবুও অরিজিতের কথাগুলো ওর পোড়-খাওয়া বুকে হাতুড়ি পেটায়। খট্ খট্ শব্দ করে ওর মনে ঘুন ধরায়।

অরিজিত একটা সরকারী সংস্থায় চাকরী করে। ও দেখেছে মাইনে যা পায় তা দিয়ে সংসার চললেও বাড়তি খরচের জন্য মাঝে মাঝে বড্ড অসুবিধা হয়। প্রথম প্রথম এখান ওখান থেকে কিছু ধার টার করে ও চালিয়ে নিতে চেষ্টা করত। কিন্তু একবার ধারের গোলকধাঁধায় পড়লে আর বেরোবার পথ পাওয়া মুস্কিল। শেষ পর্যন্ত তো এক বার স্ত্রীকে ভাজিয়ে ভাজিয়ে ওর একটা হার বিক্রিই করে ফেলেছিল ও।

একটা রশিকে টেনে আর কত বড় করা যায়? আলগা হওয়ার সীমাও একটা আছে তো।

তাই ও ঠিক করে বারকার ঘোষ করে উৎসবের খরচের জন্য একটা স্পেশিং স্কীম তৈরী করবে।

যেমন চিন্তা তেমনি চটপট ডিসিশনও নিয়ে নেয়। কাউকে না বলে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা রেকারিং ডিপোজিট একাউন্ট খুলে। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকার। ভাবে কোন রকমে দু'টো বছর চালিয়ে নিতে পারলে ঐ টাকাটা তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে ফেলবে।

মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি? সুদের টাকায় দিব্যি খুচখাচ খরচগুলো চালিয়ে নেবে। বেশ একটু হালকা বোধ করে কিছুদিন ও।

প্রথম ক'মাস একটু টেনে টুনে ঐ টাকাটা জমা দিয়ে আসছিল।

কিন্তু যতই দিন এগোতে থাকলো টানাটানিটা একটু একটু বাড়তে লাগলো।

বছর দেড়েক পর থেকেই ছেলে কিংবা মেয়ে অথবা স্ত্রী যদি কোনও কিছু কিনে দিতে বলতো তখনই ঐ গুপ্ত সম্বলটার দিকে একটু মায়া মায়া ভাব নিয়ে ও বলতো একটু ধৈর্য ধরতে হবে যে তোমাদের। সমস্ত চাহিদাই মেটাবো। কিন্তু এখন না। ডিসেম্বর আসুক।

ওরা অবাক হোত। ভাবতো ডিসেম্বর মাসে এমনি কি একটা হবে যাতে ওদের চাওয়াটা পাওয়ায় রূপ পাবে।

একটু একটু করে ওদের মনে এই ধারণা

ছেলে অরিজিতের ভাগ্য তাগ্য খুলে যাবে হয়তো ঐ সময়। কোনও জ্যোতিষ হয়তো হাত দেখে বলেছে এ রকম হয়ও ওরা অনেকটা ভরসা পায়।

একবার ওর ছোট ভাইপোর জন্মদিন। সস্তারীতি দোকানে গেছে ওরা। একটা কিছু কিনবে।

ভাইপো কাকাকে বললে, কাকু দোকানে যা আছে আমি চাইলেই পাবো?

ছোট্ট ছেলে। ওর তো আর কাকুর পকেটের অবস্থা জানার কথা নয়।

অরিজিত একবার দোকানীর দিকে আড়চোখে তাকালো। যাতে সে শুনতে না পায় এমনি গলায় বললো

'আসছে বার। এবার ঐ খেলনাটাই নাও।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ছোট ভাইপো কাকার মুখের দিকে তাকায়।

খেলনাটা নিয়েই ওরা দোকান থেকে বেড়িয়ে এলো। খাম দিয়ে আর ছাড়লো অরিজিতের

কেয়া ক'দিন ধরে দেখছে দুধ আল দেওয়ার সসপ্যানটা একদম ভেঙ্গে গেছে। ওতে আর দুধ টুধ আল দেওয়া যাচ্ছে না। একটা নতুন কিনে নেওয়া দরকার। কতা টাকাই বা দাম? অরিজিত স্ত্রীর ঐ সামান্য জিনিষটাও কিনে দিতে চায় আগামী ডিসেম্বর এলে। কেয়ার অভিমান হয় মনে মনে। স্বামীকে সসপ্যানটা কিনে দিতে আর পীড়াপীড়ি করে না। শুধু খোকাকে কাছে ডেকে বলে, সসপ্যানটাও তোর বাপি ডিসেম্বরে কিনবে বাপিকে জিজ্ঞেস কর তো ডিসেম্বরে আর কী কী কেনা হবে।"

—"কেন, ক্যারামবোর্ড, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল সবকিছুই। বাপি তো বলেই দিয়েছে—"ছোট্ট উত্তর মনোজিতের।

হাসবে না রাগবে বুঝতে পারে না কেয়া। টাকার ভাবনায় লোকটার মাথা টাথা খারাপ হল নাতো? কিন্তু অরিজিত পরে দেখলো, ডিসেম্বর আসার আগে হঠাৎ কতগুলো এমন দরকার পড়লো যা এড়ানো সম্ভব হোল না। কাইনাল উপড়ুয়াল হোলে দেখা গেল তিলতিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমার কোথা থেকে কে যেন এক খাবলা কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেছে

যা জমিয়েছিল তার প্রায় সবকিছুই লোন দেওয়া হয়ে গেছে। এত কড়া নজর সত্ত্বেও।

অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও সেই খানেই দাঁড়িয়ে আছে।

একটুও এগুতে পারে নি ও। মাসের পর মাস চাওয়ার যে লিষ্ট ওয়েট করছিল সে গুলোর ডিসপোজাল দেওয়াও আর সম্ভব না।

তবু পিছু হটেনি অরিজিত। আবার একটা নতুন একাউন্ট খোলে।

হঠাৎ যদি কেউ আবার কিছু চায় তার জন্যে মনে মনে উত্তরটা জানিয়ে রাখে— ডিসেম্বর আসুক।

ঐ অরিজিতের টাকা জমানোর কথাটা ভাবতে নীলাদ্রির বুকে শুধু নতুন করে আর একটা হাতুড়ির ঘা পড়ে।....

পূজোয় চাই নতুন জুতো

খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো

লিলিপুট ১৪
সাইজ ৫-৮
টা. ১৭.৯৫

Bata

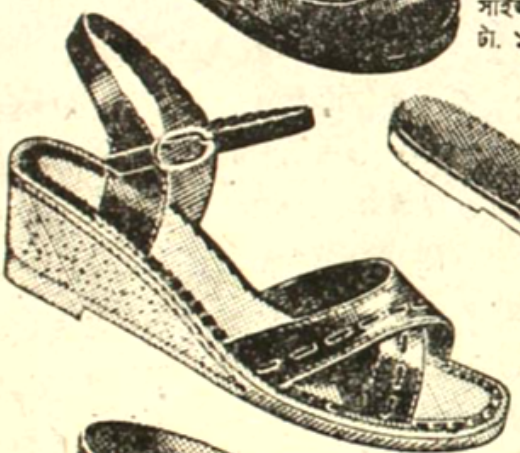

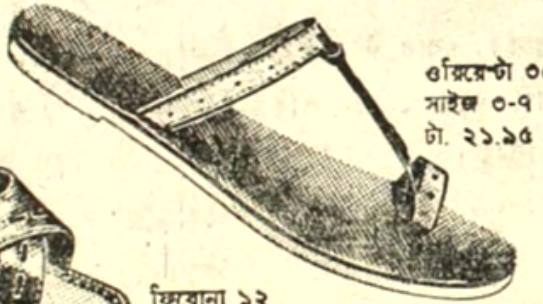

ওরিয়েন্টা ৩৫
সাইজ ৩-৭
টা. ২১.৯৫

ফিরোনা ১২
সাইজ ৩-৭
টা. ৩২.৯৫

Bata understands shoes

এক্সক্লুসিভ
মুন সারফেস ২৪
সাইজ ৫-১০
টা. ৬৮.৯৫

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য ব্যাখ্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ শঙ্কর, শ্রীধর বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। জগদ্গুরুর সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপদেশের। বৃহত্তর আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ আর্টেটসহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, আর্টেট সহ ১১·০০ টাকা

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যায় জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয় মন্দিরে [illegible] ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

টীকার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	বিরা পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	সরল পাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
লঘু গীতা		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	Soul of India speaks	৭·০০
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ	শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ বি টি	
বাঙ্গালার বাঙালী	ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার ঋষি	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার বিদুষী	শরীর ও শক্তি	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
রবীন্দ্রনাথ	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬.৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

সর্বথা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রে সি ডে সি লা ই ব্রে রী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

দশের কল্যাণে

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

'জীবনের সকল বৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া জীবনের ওপারে ভগবানকে পাওয়াই ছিল এতদিনকার সাধনা, ভগবান ছিলেন ও আছেন জীবনের বাহিরে। ভগবানের নাম মানুষ নেয়, কিন্তু জীবন বদলাইবার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু ভগবান তো জীবনবহির্ভূত, জীবনধন। জীবনকে যে ভাবে গড়াইলে গুছাইলে বৃহত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই ভগবত্তা। জীবনের ভিতরই ভগবান। এই ভাবেই ভগবানকে আমি বুঝিয়াছি এবং এই ভাবেই অনন্ত ঘটনার ছিদ্র দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতিকে ভগবদ্ভাবে রচনা করিতে করিতে অনন্ত কাল চলিতে হইবে। এতদিন ছিল জীবনকে সঙ্কুচিত করিতে করিতে সকল বৃত্তিকে নিরোধ করিতে করিতে চলা; এইবারের সাধনা হইবে জীবনকে ব্যাপকতর করিতে করিতে, সকল বৃত্তিকে প্রসারিত করিতে করিতে অনন্ত কাল চলা। ভগবদ্ভজন creative এই সৃষ্টি অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে। তাই তাহার মুক্তি নাই। মুক্তি নাই তাহাদেরও যাহারা সকল বৃত্তির নিরোধ করিয়া চলিতে চান —কেননা, প্রকৃতি যে নিত্য অনন্ত; অনন্ত বস্তুর নিরোধও অনন্ত কাল ধরিয়াই চেষ্টা করিতে হইবে, ফলে লাভ হইল নিরোধ-পথে একটা নৈরাজ্যবাদ; আর ব্যষ্টির পথে সাম্রাজ্যবাদ। জীবনে মুক্তি বন্ধন দুই-ই নিত্য, পারমার্থিক। নিরোধ-পথে সমাজ গঠন ব্যবহারিক মাত্র। উহার কোনও আদর্শগত নিত্যতা নাই। ছাড়িবার জন্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে ব্যষ্টির পথে সমাজ রাখার জন্যও রাখা। ইহাই পূর্ণতার সাধনা।

অল্প-বহুর ভেদ, পরিমিত-অপরিমিতের ভেদ পুরুষোত্তমে নাই বলিয়া অল্প কাল, অল্প দেশ, অল্প অধিকার, অল্প সুযোগ লইয়া আছে তাহারাও পূর্ণ সম্পদের অধিকারী হইতে পারে। বৃত্তির দর্শন জোর দেয় অধিকের উপর, বড়র উপর, অনেকখানির উপর। কিন্তু গীতাদর্শে 'অল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। অল্প অল্প থাকিয়াও পূর্ণ, কণিক কণিক থাকিয়াও পূর্ণ। পূর্ণ হইবার জন্য তাহার অধিকের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই। অল্প অধিককে চাহিবে শুধু তাহার নিজ পূর্ণতাকে পূর্ণতর পূর্ণতম পরিপূর্ণ করিতে। অধিককেও পরিপূর্ণতার আস্বাদন করিতে হইলে অল্পের দ্বারে আসিতেই হইবে। অল্পকে স্বীকার না করিলে অধিকও ক্ষুদ্রই হইয়া থাকিবে।....'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-চিন্তপঞ্জী ১৯৫৬

Central Regd. No. R. N. 2571 57 Phone No 57-2540 UJJWALBHARAT

.....জাতি যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের হৃদয় জোড়া করিতেছিল, ছোট করে, ছোট করে, ছোট নীড় রচনা করিবার পথ খুঁজিতেছিল না, তখন তাদের মাঝখানে সকল হৃদয়ের সামঞ্জস্য করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন. সেই ধর্ম লীলা ও তাহার মর্মকে শ্রীশ্রীনিতাগোপাল বর্তমান যুগের বুকে প্রকট করিয়াছেন

—ছোটদের আত্মবিকাশের দর্পণ ও পথ পরিচয়ের নীড়ের বইগুলিতে

'ভারতবর্ষ অস্ত্রে অজেয়বটে, কিন্তু আদর্শের দিকে সে আজ বড় কাঙাল' এই [illegible] বাহিরে সে আজ দুই জন, দ্বন্দ্ব-সমাকুল

—এই দ্বন্দ্ব-সমাধানের দর্পণ ও পথ পাইবেন নীড়ের বইগুলিতে

25 OCT 1978

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

পুস্তিকা		পাণ্ডুলিপি	
১	ব্রহ্মসূত্র (অনূদিত ভাষ্য)	গুরুদেব ও উপনিষৎ ১	টাইপ করা
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ৫·০০	দশ বৎসরের দিনপঞ্জী	ছাপার
	২য় খণ্ড (১ম অধ্যায় পর্যন্ত) ১০·০০	ইত্যাদি	
	৩য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ২·০০		
২।	ঈশোপনিষৎ ৫·০০		
৩।	কেনোপনিষৎ ১·০০		
৪।	কঠোপনিষৎ ৫·০০		
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ ১·০০		
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ ১·০০		
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ		
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪·০০		
৮	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৪·০০		
	মুণ্ডকোপনিষৎ		
৯।	শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও চরিত্রে ৫·০০		
১০।	মহাত্মাজীর গঠন-মূলক কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০ (গান্ধী শতবার্ষিকী কর্তৃক প্রকাশিত)		
১১।	শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা		

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	২·০০
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	১·০০
শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন	৫·০০
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	
রবীন্দ্র ছন্দ	৫·০০
প্রাথমিক শিক্ষা	৯·০০

॥ ডঃ প্রতিভা রায়ের ॥

নারী প্রগতির অন্তরায়	৯·০০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য এবং শিষ্যা নিতাগোপাল চক্রবর্তী ও সুধার কথা	৩·৫০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম: বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, (তার—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা ৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে. বি. লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত

নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
আমি বিশ্ব নাগরিক সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয় এই বিশ্বই আমার মহামঠ
আকার-সাকার নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়"।

অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৮ সম্পাদক—রেণু মিত্র ৩১ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঘোষণা

বিগত কয়েক বৎসর নানা অনিবার্য কারণে 'উজ্জয়ন্তভারত' পত্রিকাকে মাসিক হইতে দ্বিমাসিকে পরিণত করিয়া ইহার স্থিতি বজায় রাখা হইয়াছে। উজ্জয়ন্তভারতের পাঠক ও অনুরাগীদিগকে আমরা সানন্দে জানাইতে চাই যে আগামী মাঘ ১৩৮০ হইতে ইহার ৩১-তম বর্ষারম্ভ হইতে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি লইয়া বিভিন্ন রচনায় সমৃদ্ধ করিয়া আমরা উজ্জয়ন্তভারত পত্রিকাকে পুনরায় মাসিক পত্রিকারূপে নব কলেবরে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। মাসিক মূল্য তখন এক টাকা এবং বার্ষিক বারো টাকা ধার্য হইয়াছে।

—সম্পাদিকা, উজ্জয়ন্তভারত

উজ্জয়ন্তভারত:
প্রতি সংখ্যা ১০০, শারদীয়া

Phone : 57-2540

Ujjwal Bharat

A MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

C/o NARANARAYAN ASHRAM,
Vill. Bagulati, P. O Ashwininagar, Via – Calcutta-59
Dist. 24-PARGANAS.

Dear Sir,

I am glad to announce that "**Ujjwal Bharat**" an organ of the Religio-Social organisation Naranarayan Ashram will henceforth be brought out as a full fledged literary monthly journal from its 32nd year commencing from Magh. 1385 B. S. (January. 1979). This will contain contributions of reputed as well as promising Bengali literateurs in various branches of literature like novels (in serial) short stories, poems, belle-letters, essays, translations from world literature etc. This will also contain educative as well as entertaining regular features on Sports, Children, Women, Industries, Music etc to make it of absorbing interest to all sections of people

But success of this venture depends on your co-opertion and generosity by way of subscribin for it and/or booking a space for advertisement for which I appeal to your goodself. For your kin information I mention that after meeting the expenses for publication of the journal any availabl surplus fund will be utilised in other philanthrophic and religio-social activities of the Ashram lik running of school for children, vocational training centre for women, library and free reading roon publication of commentaries on Vedanta, Upanishadas and Geeta etc. written by the founder of th Ashram Swami Purushottamananda Avadhut etc.

We are looking forward for your generous contribution.

Thanking you,

Renu Mitra

(RENU MITRA)
Editor, Ujjwal Bharat.

PARTICULARS ABOUT THE JOURNAL

Printing Space : Approximately 20 cm. × 15 cm. (Double Crown ¼ Size)

RATES FOR ADVERTISEMENT :

Ordinary Full Page—	Rs. 125/-	Fourth Cover—	Rs. 200/-
Half Page—	Rs. 75/-	2nd & 3rd Cover—	Rs. 150/-
Quarter Page—	Rs. 50/-	Half Page—	Rs. 125/- (Inside Reading mat
		Quarter Page—	Rs 75/-

Annual Subscription for Journal Rs. 12/- (With Postage)

Payment may please be preferably made in A/c. Payee Cheques in the name of UJJWAL BHARA

CONTRACT FORM

The Editor,
UJJWAL BHARAT
C/o. Naranarayan Ashram,
Vill. Baguiati, P. O. Ashwininagar, Via—Calcutta-59
Dist. 24-Parganas.

Madam,

Please reserve one ....page advertisement in your 'Journal' @ Rs .....per month for ....months. The advertisement material is enclosed.

Yours faithfully,

Date ....

Signature.

Name of Organisation .....

Address.....

Office Stamp.....

উজ্জ্বলভারত

পৌষ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৮

জীবন তত্ত্বে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীসুনীতি সান্যাল

ওঁনমো নিতাগোপালায়।
নমো পুরুষোত্তমানন্দায়॥

ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে মনন্তত্ত্বকে অবলম্বন করে অবিদ্যাক্ষেত্র এই বিশ্বকে রূপে গড়ে তোলবার মন্ত্র ও জীবন চালনার ছন্দঃ ভারতীয় দর্শনে রেখে গেছেন তাকেই স্মরণ ও এই বিশ্ব মহামঠের বিশ্ব - নাগরিক ভগবান শ্রীশ্রীনিতাগোপালদেবের অপার কৃপা-ধন্য শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহা-রাজের আজ শুভ জন্ম তিথি। আজ থেকে ৯১ বৎসর পূর্বে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার কাঁকরদা পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম। আজ তাঁর জন্মদিনে নরনারায়ণ আশ্রমের উৎসবের দিন, তাঁর জীবন ও দর্শন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও মনন করবার দিন সকলের সঙ্গে সমবেত হয়ে। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হবার বুদ্ধি প্রার্থনা করি শ্রীনিতাগোপাল - পুরুষোত্তমানন্দ চরণে প্রণত হয়ে।

স্বামী-পুরুষোত্তমানন্দ সামগ্রিক জীবনে এমনই এক দিব্য জীবনের বার্তা ছিল যা যে কোন স্তরের যে কোন অবস্থায় মানুষের জীবনে মুক্ত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত পথের হদিস দিতে পারে। তাই বর্তমান সমস্যা - জর্জরিত বিশ্বে-প্রতিটি নরনারী যে যে বৃত্তিতে বর্তমান, সেখান থেকেই জীবনকে ঊর্দ্ধে আসীন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, নইলে জীবন তো যে কোন একটা খাতেই বয়ে যায়, আটকে যায় আমরা ভারতবর্ষের মানুষ কেউ হয়তো অর্থ-সমস্যায় জর্জরিত, আর কেউ হয়ত একান্ত ব্রহ্মবিলাসের সাধনায় আকুল। দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধানে ভারতবর্ষ আত্মস্থ হতে পারে নি। প্রাণ-দর্শনের যে ধারা ঔপনিষদিক যুগে প্রবাহিত হয়েছিল সে ধারা ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়ে গেছে। এই প্রাণ - দর্শনের মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীনিতা-গোপালদেব প্রাণের আঁঠাতে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে মিলনের বারতা সূত্রাকারে বিশ্ব জনের কাছে রেখে গেলেন বলে গেলেন নতুন দর্শনের ভাষায় জড়-অজড় সমন্বয়, নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, আত্মা অনাত্মা সমন্বয়, জ্ঞান-অজ্ঞান, সমন্বয়, সাকার - নিরাকার সমন্বয়, আকার-নিরাকার সমন্বয়, দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়, দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়, সর্ব্ব সমন্বয়।

যুগ যুগ ধরে এই উল্লিখিত বিষয়ের দ্বন্দ্বের ফলে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, আকারে, সাকারে, নিরাকারে, সংসারে সন্ন্যাসে, রাজনীতিতে জীবননীতিতে কিছুতেই মেলানো পাচ্ছে না। বুদ্ধির দ্বারা পাঁচে সুবিধা

আদায়ের জন্য কিছুটা গোঁ-ও থাকে সেখানে একেবারে অনুপস্থিত।

তাই আজকের দিনে শ্রীনিত্যগোপাল - পুরুষোত্তমানন্দের জীবন- চেতনার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ছন্দ মানুষের পরম প্রয়োজন। তাই আজকের সন্ধিক্ষণের অতি দুর্দিনে দুর্গত মানুষের কাছে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ - জন্ম উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করবার প্রয়াসী হয়েছি। সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রেখেও যিনি সুযোগে পরে তুলতে পারেন সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণপ্রভাবে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সারা জীবন মানুষের কাছে সেই জীবন - চেতনা শেখাবার পরমী শিক্ষক রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন।

বরিশালের কাঁকরবা গ্রামে মাতা মুক্তকেশী, পিতা নীলকমল ঘোষের কোল আলো করে শরৎ কুমার ঘোষ সেদিন আকাশের নির্মল আলোকে আলোকিত জীবনখানি নিয়েই যেন পৃথিবীতে এসেছিলেন। ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শরৎকুমারের মুখে কথা ফোটেনি। ছয় বৎসর নীরব তপস্যায় তপস্বী শরৎকুমারের ভাষার যে বাণী রূপ পেল তা তিনি বিশ্বদেবতা ও বিশ্বজনের সেবায় আজীবন ব্যয় করে গেলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর জীবনাচরণে বিনয়, ধৈর্য, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, অপরকে ভালবাসা ও মর্যাদা দানের গুণগুলি পরিলক্ষিত ছিল। এ সকল গুণগুলি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। কেমন একটা আপন ভোলা ভাব যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কিশোর ঘনীভূত বেদনার কান্না ঐ কিশোর বয়স থেকেই শরৎ কুমারের বুকে বাসা বেঁধে ছিল। দুর্গা মূর্তি তাঁর ভাল লাগত — বিসর্জনের দিন আকুল হয়ে মা, মা বলে কাঁদতেন। না কেঁদে যেন তাঁর ভাল লাগত না — তাই গর্ভধারিণী মা যেন মরে গেছেন এই কথা মনে মনে কল্পনা করে খুব কাঁদতেন।

এই কান্নাই তাঁর বুকের ভেতর প্রতিটী মানুষের বেদনায় ঘনীভূত হয়েছিল। স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা জননীর চোখের আর কতটুকু জল! সেদিনের বরবাদী দেখেছে তাঁর চোখের জলের বন্যা। তিনি যেন সব মানুষকে বুকের ভেতরে পুরে তাদের সব তাপ শুষে নিতে চান! সত্যিকারে মানুষ গড়বার উপাসনায় সারাজীবন এই কাঁদে গেছেন। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ভেতরে একটি বিপ্লবী মানুষ ঘুমিয়ে ছিল। বালক বয়সে একটি ছবি দেখেছিলেন একজন মানুষ পৃথিবীর ছবিটাকে ঠেলছে। বালক শরৎকুমারের সেই ছবি দেখে চিত্তের ভেতরে নাড়া দিয়ে উঠল, একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল জগৎটাকে ঠেলে এগিয়ে নেবার জন্য।

পুত্রের উদাসীন মনোভাব দেখে পিতা নীলকমল ঘোষ তাঁকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করবার জন্য মাত্র উনিশ বছর বয়সে ঢাকার শ্রীনগরের জমিদার বংশের কন্যা শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিনী দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন। তাঁর এই বিবাহ প্রসঙ্গে শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন কলাভবনের ডিরেক্টার লিখছেন, "শরৎ দাদার বিবাহ হয় ঢাকা শ্রীনগরের ধনী জমিদার বংশে। বরযাত্রীদের সঙ্গে এমন উদাসীন ভাবে যাত্রা করিতে কোনো বরকে কখনও দেখি নাই।" অর্থাৎ জীবনের কোন ঘটনাই তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে নি। একটা ব্যাপকতর সত্তার আহ্বানে

সর্ব্বাবস্থার সঙ্গে একাত্মতা থেকেও তার অতীত থাকতে পারছেন। তাই তাঁর জীবন-ইতিহাসে দেখতে পাই সংসারী শরৎকুমার, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা শরৎকুমারই সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ। তাই অবশ্য শরৎকুমারের জীবন-চালনায় পত্নী উমা দিনী দেবী ছিলেন অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী রূপী। যতই দিন যেতে লাগল একটা প্রচণ্ড আদর্শবাদের সঙ্গে বিশ্ব-প্রেমের উল্লাসনায় প্রাণ তাঁর অস্থির হয়ে উঠল। পড়াশুনা এই জগতের বুকেই যেমন করে শান্তি লাভ করা যায়, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়, যেমন করে গত শতাব্দীর এই বিশ্বের বুকেই বিপ্লবীরা তাঁর প্রাণকে আলোড়িত করে তুলল। অবশেষে ১৩১১ সনে বাইশ বৎসর বয়সে সর্ব্বসময়য়ের আচার্য্য শ্রীনিত্যগোপালদেবের চরণ প্রান্তে শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য লাভ করলেন, তাঁর বিপ্লবী প্রাণকে পরিচালনার জিম্মাদারী পেলেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন চালনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনও একক জীবন যাপন করেন নি, যখন যেখানে থেকেছেন সংঘ বা গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। সপ্তাব্রত সমিতি, স্বরাজ-সেবক-সংঘ, গৌড়াঙ্গ গোষ্ঠী, বিশ্বকল্যাণ সমিতি প্রভৃতি সংঘ নিজে সৃষ্টি করেছেন আবার তাঁর উদ্দেশ্য সফল না হলে তা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে যাত্রা সুরু করেছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশেষ কোন আবেষ্টন-গত পন্থাতেই চলতে অভ্যস্ত থাকি। কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সবকিছু আবেষ্টনের ঊর্দ্ধে থেকে একটু মুক্ত জীবন প্রবাহের স্বচ্ছতা ছিল বলে তাকে কোন কিছুতে আটকে রাখতে পারে নি।

রাজনৈতিক পট ভূমিকায় বরিশালের শরৎ কুমার তথা পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ব্রিটিশের ভারত শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক স্বর্গীয় দুর্গামোহন সেন মহাশয় বরিশাল-নেতা শরৎকুমার সম্বন্ধে লিখেছেন "উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র শ্রোতৃবর্গ শ্যামল দুর্ব্বাদল মণ্ডিত ভূমির উপরে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার বাক্য-সুধা পান করিতেছে নীরব নিশ্চল হইয়া। তিনি আনিলেন অসহযোগের নূতন বাণী। সে বাণীর মিশ্রিত হইল রাজনীতি ও নীতি। তাঁহ কঠিন দর্শনের সহিত মিতা নৈমিত্তিক জীবনের অল্প। পরমাত্মার সমন্বয় স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেখাইয়াছেন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথির সহিত বর্ত্তমান স্বরাজ যুদ্ধের কতখানি সামঞ্জস্য। এমন করিয়া তিনি এক চতুর্থ শতাব্দী বরিশাল তথা সমগ্র দেশে আত্মিক বলের সহিত লৌকিক বলের সমন্বয় করিয়া লোকের মনে এক ভাব-বন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব, শ্রীর সকল অলঙ্কার স্বরাজ ভাণ্ডারে ঢালিয়া দিলেন"

এমনি করে সারা বাংলা ও ভারতের বহুস্থানে তিনি তাঁর স্বরাজ মন্ত্রে ভারতবাসীর প্রাণ স্বরাজ সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কয়েকবার তাঁকে কারাগারে বন্দী করে ছিল। সেখানেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। কর্ম্ম ক্ষেত্রের বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দ জেলে থাকাকালীন শ্রীনিত্যগোপাল-আলোক ভারতীয় দর্শনে

"বিশ্ব সত্য জগৎ মিথ্যা" মতবাদের ভিতরে নাড়া দিলেন পুরুষোত্তম - দর্শনের ভাষায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বসমন্বয়ের ভিত্তিতে গীতা আর প্রস্থান ত্রয়ীর খানা উপনিষদের ভাষা লিখে গেলেন ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন চলনার পাথেয় হিসাবে "সমন্বয়ক্ষেত্রেই তাঁহার একটা মৌলিক দৃষ্টি ছিল, গতানুগতিক পন্থার বাহিরে তিনি এক উচ্চাসনের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতের সমন্বয়, ধর্ম ও কর্ম - সাধনার সামঞ্জস্য, প্রাচীন আদর্শের সহিত নূতন সর্ব্ব জাগতিক আদর্শ বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য স্থাপনের পথ প্রদর্শনে এইরূপ কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও মর্মস্পর্শী করিয়া তোলায় তিনি যেরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহা তাঁহার অনন্ত - সাধারণ, অসামান্য ও অলৌকিক সাধারণ মনীষার পরিচায়ক" —দুর্গামোহনবাবু আরও লিখেছিলেন

তাঁর স্বরাজ সাধনার সাধ্যবস্তু ছিল ব্রিটিশ শোষণ মুক্ত ভারত ভূমিতে স্বরাজের নতুন রূপ প্রতিষ্ঠা। তাঁর ভাষায় 'পূর্ণ স্বরাজ যাহা তাহা সমত্বের সমান মানের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত পুরুষ যেখানে সম মান ও সম মানদ, রাজা - প্রজা যেখানে সম মান ও সম মানদ, স্পৃশ্য - অস্পৃশ্য যেখানে সম মান ও সম মানদ, ধনিক - শ্রমিক যেখানে সম মান ও সম মানদ, স্বর্ণ ও কৃষিজাত দ্রব্য যেখানে সম মান ও সম মানদ সেখানে পূর্ণ-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে শ্রমিকের সুখ দুঃখ ধনিকের, ধনিকের সুখ দুঃখ শ্রমিকের সেইখানেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত'। তাঁর স্বরাজের এই স্বপ্ন আজ পর্যন্ত ভারতের মাটীতে রূপ পায় নি। তবুও ভারতের এই স্বরাজ - সুন্দর রূপই, আমরা ধ্যান করব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম এই আদর্শকেই জীবনে রূপ দেবার শক্তি প্রার্থনা করবে

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ এতখানি বিরাটত্বের অধিকারী হয়েও কেমন সাধারণ জীবন যাপন করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর জীবনের সব কিছুতে চলার ভেতরে একটি কথাই ফুটে উঠেছে সত্য হচ্ছে বিশ্ব - নাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতপাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। নিজেকে সকলের সঙ্গে এক করে দেখেছেন বলেই সারা জীবন ভাল না খেয়ে না পরে অতি কৃচ্ছ্র জীবন যাপন করেছেন। এই কৃচ্ছ্রতা তাঁর দেহে মনে কর্মে জ্ঞানে প্রেমে ভক্তিতে এতটুকু ছাপ ফেলতে পারে নি তাই পঞ্চাশ দিন অনশন করেও সেদিন অনশন ভাঙ্গেন সেদিনও জনসভায় বক্তৃতা দিতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয় নি অতি নগণ্যতম মানুষকে তিনি বুকে তুলে নিয়ে একাত্ম করে দেখতেন চোখের জল মুছিয়ে সকলের দুঃখকে দূর করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন আবার তাকে সাধারণ আসক্তি - বিদ্বেষের স্তর থেকে বিশ্ব - প্রেমের স্তরে উন্নীত হবার শিক্ষা দেবার জন্য নিজের প্রাণ ঢেলে দিতেন।

এমনই একজন সর্ব্বক্ষেত্রে বিপ্লবী মহান মানুষ ছিলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ আজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের তালিকায় ভারতবাসীর কাছে নেতা শরৎকুমার তালিকাভুক্ত হন নি, কেন না তিনি যে একান্ত করে নিছক রাজনীতি করেন নি। তিনি যে নিজ মুখেই বলেছিলেন– "আমি রাজনীতি করি না, রাধানীতি করি"। আবার সন্ন্যাসীর দলেও

তো তিনি চিহ্নিত হতে পারেন নি কেননা জগতের কোন সম্পর্ককেই তিনি মায়া মিথ্যা বলে দূরে সরে যান নি। আবার সংসারীর দলেও তিনি চিহ্নিত নন কেননা প্রচলিত আসক্তি - বিদ্বেষের সংসারে তিনি অবধূত সন্ন্যাসী। শ্রীনিতাগোপাল নিজের পরিচয়ে যা লিখেছিলেন তারই আরেক রূপ আমরা পুরুষোত্তমানন্দ - জীবনে লাভ করেছি। শ্রীনিতাগোপাল লিখেছেন, "আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কাটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজী মৌলভীর নিকট কলমা পরে মুসলমানি হই নাই, মুসলমানের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। খ্রীষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবেনা। বাহ্যিক পূজাঅর্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহিনা, ইহাতে সাধারণ হিন্দুগণ আমাকে নাস্তিক বলিবেন। এখন কোন দলে তো আমাকে নিবেনা। আমিও দল চাহিনা। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই সেই জন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল"। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সাম্প্রতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করেও কোন একটা বিশেষ অস্তিত্বে তিনি নিজেকে আটকে রাখেন নি বলে তাঁকে ধরা খুব কঠিন আজ তাঁর স্মরণসভায় এই কথাটিই মনে জাগছে যে ঐ মানুষটীর জীবনে একদিকে বিশ্বনাগরিক ভগবান শ্রীশ্রীনিতাগোপাল - যান, অপর দিকে বিশ্বমানবকে প্রেম ভালবাসার মধ্যে দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তোলবার অনলস প্রচেষ্টা। তাই সমবেত হয়ে প্রার্থনা জানাই নর-নারায়ণ আশ্রম - দেবতা শ্রীনিতাগোপাল - পুরুষোত্তমানন্দ চরণে—তোমাদের প্রদর্শিত পথে চলবার মত কর, জ্ঞান, ভক্তি প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর, সার্থক কর

পরিশেষে তাঁর প্রয়াণের কিছুদিন আগের দিনলিপির একটি লেখা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি:— "বিশ্বের প্রতি সম্প্রদায়ের মতবাদ, সাধন পন্থা সকলের। পূর্বেও আজও শ্রী পুরুষের ক্ষেত্র ও পথ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। পুরুষের জন্য এক প্রবেশ পথ মহিলাদের জন্য ভিন্ন কালের বিধানে আজ সব পথের মানা দিয়া সব পথ চলিয়া গিয়াছে। প্রতি পথেই প্রতি মানুষ যাতায়াত করিতেছে প্রত্যেকের সাধনা আজ সাইকোলজিকাল হইতে যাবা, ইহাই world সাধনা। যে সাধনা বিশ্ববাসী — আস্তিক বা নাস্তিক হউক— গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই শ্রীনিতাগোপাল দিতে আসিয়াছেন অদ্বৈতবাদের মধ্যদিয়া, দ্বৈতবাদের মধ্যদিয়া আস্তিকতার মধ্যদিয়া, নাস্তিকতার মধ্যদিয়া বিশ্বপথ বা ব্রজপথ চলিয়া গিয়াছে, শ্রীনিতাগোপাল বর্তমানে যুগে সেই পথের আদি পথিক। ইহা কোন সম্প্রদায়ের নয় অথচ সকল সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় পথ। এই সাধনায় বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ বেশ ভূষা, বিশেষ বিশেষ আচরণ আজ কিছুই চলিবে না অর্থাৎ চলিবে সহজ মানুষের সহজ আচরণ। সহজ জীবন সহজ বলিয়াই flexible. তাই প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের মত হইয়া কাহারও মত না হইলেই সে সহজভাবে বেশ চলিয়া যাইতে পারে। আমি এই পথের

সন্ন্যাসব বলিয়া কেহ জগতের সঙ্গে থাকিতে পারিল না। আমি বিশ্বপ্রেম হইয়া সংসারের সর্ববিধ সম্বন্ধের মাঝে ভগবৎ-সম্বন্ধ আস্বাদন করিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ stateless society-র আদর্শ বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিজের ঈশ্বর-রূপ জীবের মাঝে মুছিয়া জীব-সঙ্ঘ রচনা করিবার কৌশল শিখাইয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের নির্ব্বাণই stateless society র জন্ম দান করে"।

আপনজন পুরুষোত্তমানন্দ

—শ্রী শান্তশীল দাশ

●

পৃথিবীর জন সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। অসংখ্য মানুষ এখানে কিন্তু কী আশ্চর্য! মানুষ যেন দিন দিন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। অসংখ্য মানুষের মধ্যে থেকেও সে আজ নিঃসঙ্গতায় ভুগছে।

পৃথিবী জনাকীর্ণ। অপর্যাপ্ত তার ভোগের উপকরণ। নানা উৎসবের আলোক-মালায় সে সজ্জিতা। কত বিচিত্র সুরের ধ্বনি সেখানে। কিন্তু মানুষ? মানুষ সেখানে বহু একা। পাশাপাশি বাস করছে। প্রতিদিন কত আলাপ আলোচনা। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না কেউ কারুর মনের স্পর্শ পায় না। কেউ কারুর আত্মীয় নয়, আপনজন নয়।

এমনি এক পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। প্রতিদিন যথারীতি উঠছি, কাজ করছি, সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাচ্ছি, উৎসবাদিতেও যোগদান করছি সবই করছি, কিন্তু মনের দিকে যখন তাকাচ্ছি, তখন দেখছি, সে কি নিঃসঙ্গ ভারাক্রান্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। কি যেন সে চাইছে! কি যেন সে পাচ্ছে না! না-পাওয়ার বেদনায় মুহ্যমান হয়ে কালক্ষয় করছে।

ঋষি বশিষ্ঠ তপস্যায় যাবেন। যাবার সময় পত্নী মৈত্রেয়ীকে সংসারের ভার দিয়ে গেলেন। আর আর্থিক অনেক কিছু সম্পদ। কিন্তু মৈত্রেয়ী বললেন, দেব, আপনার এই সব সম্পদ লাভ করে কি আমি অমৃতা হব? ঋষি বললেন, না তা হবে না। মৈত্রেয়ী তখন বললেন,

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।
[অমৃতা হব না আমি লভিলে যে-ধন
সে-ঐশ্বর্যে বল মোর কিবা প্রয়োজন।]

সত্যিকার বাঁচতে গেলে এমন কিছু চাই যা পেলে অ-মৃত হওয়া যায়। কি সে বস্তু? আনন্দরূপম্ অমৃতম্ আনন্দই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। নির্মল আনন্দ। সে আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত। জীবনের ভোগের অজস্র উপকরণ দিনে দিনে সঞ্চিত হচ্ছে। ভোগ করছি আমরা কত

কিছু। কিন্তু তারা কি সুখী? যার পানে তাকানো যায়, বাইরে সে সুখী হওয়ার ভান করে, বাহ্যিক আনন্দ-উল্লাসবহুল জীবনের অধিকারী হয়ে, কিন্তু অন্তরে সে রিক্ত, নিঃস্ব। অসংখ্য মানুষ পরিবৃত হয়ে সে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ। এ যন্ত্রণা সে প্রকাশ করতে পারছে না সংকোচে, ভোগ করাও তার পক্ষে দুঃসহ হয়েছে। নিরুপায় হয়ে নিঃশব্দে সে যন্ত্রণা সয়ে যাচ্ছে।

এই অসংখ্য ভিড় মানুষের মধ্যে দু'একজন হঠাৎ হঠাৎ যেন সামনে এসে পড়েন, তিনি এক ভিন্ন জগতের মানুষ। তাঁর আচরণ, তাঁর কথা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর জীবনধারণ প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তিনি সকলের মতন নন, একেবারে স্বতন্ত্র, অথচ কেমন যেন আকর্ষণীয়। তাঁর কাছে আসতে মন চায়, তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগে, তাঁকে কেমন যেন বড় আপনার বলে মনে হয়। তাঁর কাছে বসে মন খুশি হয়, তাঁর কথা শুনে মন ভরে ওঠে, তাঁর স্নেহ-স্পর্শ মনের দারিদ্র্য দূর করে দেয়। মন বলে ওঠে, এই তো আমার আপনজন। এই মানুষকেই তো এতদিন খুঁজছিলাম। এঁর কথা শোনবার জন্যই আমি আকুল অপেক্ষা করছিলাম, এঁর স্পর্শ লাভের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

এমনি এক মানুষ ছিলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ। এক সহজ সুন্দর আনন্দময় পুরুষ। সংসারী মানুষ ছিলেন তিনি। নাম শরৎ ঘোষ। আর পাঁচ জনের মতন সাধারণ মানুষ। কিন্তু না, সাধারণ মানুষ নন। তাই ছোট সংসার নিয়ে খুশি হতে পারলেন না। ডাক শুনলেন বৃহত্তের, ডাক শুনলেন মহত্তের। বেরিয়ে পড়লেন পথে। ঘরের মানুষ হলেন পথের মানুষ। পেলেন আপন গুরুকে। আত্ম নিবেদন করলেন সেই গুরুর কাছে। তার পর শুরু হল তাঁর জীবন পরিক্রমা। সে এক বিচিত্র জীবন! কাছে এলেন তিনি অসংখ্য মানুষের। অসংখ্য মানুষকে তিনি কাছে টানলেন। জীবনের কথা শোনালেন তিনি তাদের—বাঁচার কথা, আনন্দিত হয়ে বাঁচার কথা, বড়র মানুষ হয়ে বাঁচার কথা।

এই মানুষটিকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দেখে ছিলাম, কাছে এসেছিলাম, কথা শুনে ছিলাম, তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণাম করেছিলাম। তিনি দু'হাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে ছিলেন। তাঁর কথা স্মরণ করলে তাঁর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শের উষ্ণতা আজো মন অনুভব করি। মনে হয় আজও যদি আশ্রমে যাই, তাঁর কাছে গিয়ে বসি, তাঁকে প্রণাম করি, সেই সদা প্রসন্ন, মানব কল্যাণে ব্যাকুলচিত্ত মানুষটির পবিত্র স্পর্শ আজও পাব। কিন্তু না, পাব না। তিনি আজ স্মৃতি হয়ে আছেন। কিন্তু সে স্মৃতি অমলিন।

অসংখ্য উদ্‌গ্রীব শ্রোতা-পরিবৃত বক্তা শরৎ ঘোষকে দেখিনি আমি। দেখেছি আমি ছোট্ট পরিসরে অল্প কয়েকজন মানুষের মাঝে আনন্দমূর্তি পুরুষোত্তমানন্দকে। কাছে বসে শুনেছি তাঁর মুখের কথা, শুনেছি তাঁর শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা রবিবারের ছোট্ট আসরে। প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণ তাঁর জীবন। তাঁর কাছে এলে মনে হত খুব এক আপনজনের কাছে এসেছি। তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখন মন

ঝলকা হয়ে যেত। মন খুশি হয়ে উঠত, নিজের প্রতি সশ্রদ্ধ বোধ পুনরুজ্জীবিত হত।

মানুষকে তিনি ভালবাসতেন, কি অপরিসীম অনাবিল সেই ভালবাসা! প্রগাঢ় ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, কিন্তু বিন্দু মাত্র ছিল না অভিমান। ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অকৃপণ ভালবাসা। যে তাঁর কাছে এসেছে, সে লাভ করে ধন্য হয়েছে এই ঐশ্বর্য, সে আনন্দিত হয়েছে। এই ভালবাসার ভাষা অতি সহজ, অতি সরল; সহজে মনকে আকৃষ্ট করে, মনকে অনুপ্রাণিত করে। মন নত হয়। সে নতি স্বীকার শক্তিশালীর কাছে আনুগত্যের নতি স্বীকার নয়, প্রাণময় পুরুষের কাছে বিনম্র আনন্দিত নতি স্বীকার।

আজ সেই আনন্দময়, প্রাণময়, নিত্যগোপালা-শ্রয়ী পুরুষোত্তমানন্দের জন্মতিথি। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করতে এসেছে কিছু মানুষ এই আশ্রম প্রাঙ্গনে আলোক-মালায় সজ্জিত নয় এ প্রাঙ্গন। মুখরিত নয় অসংখ্য মানুষের কোলাহলে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে না তাঁর জয়ধ্বনি। স্নিগ্ধ শান্ত এ পরিবেশ। অল্প কিছু মানুষ, যাঁরা আজও তাঁকে মনে রেখেছেন, তাঁর অন্তরের দানকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করছেন তাঁরা এসেছেন তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁকে প্রণাম জানাতে। এ প্রণাম অনাড়ম্বর, এ প্রণাম নিঃশব্দ, এ প্রণাম অন্তরের উপাচারে সজ্জিত। এঁদের বিনম্র প্রণামের সঙ্গে আমিও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলাম। জয়তু পুরুষোত্তমানন্দ।

উপনিষদের ঋষি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

—শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গের দিগন্তপ্রান্তে বহু জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁদের মধ্যমণি না হলেও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি ভগবান্ নিত্যগোপালের শিষ্য—পত্তন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় তাই তাঁর পদযাত্রা। তাঁর ভাস্বর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি মুক্তিযজ্ঞের যাজিক, বেদান্তের ভাষ্যকার, তৎকালীন বাঙালাদেশের বিশিষ্ট বাগ্মী। শ্রম আর ত্যাগ, উৎসাহ ও ঔদার্যে চরিত্রখানি আরও মহিমোজ্জ্বল। জ্ঞানের পবিত্রতা সম্রাটের সম্পদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি আজ আমার দৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের এক ক্রান্তদর্শী ঋষি।

এখন দেখা যাক আমাদের অবধূত মহারাজকে তপোবনের তপস্বীদের পূত দর্শনের মাঝে সমাসীন করতে পারি কি না। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন করা; ঋষি হচ্ছেন দ্রষ্টা অর্থাৎ মন্ত্র-দ্রষ্টা। যাঁরা মন্ত্র-দর্শন করেন অর্থাৎ সাধনার দ্বারা জ্ঞান-রাশি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন তাঁরাই যথার্থ ঋষি।

ঋষেদের ঋষিরা নয়ন মেলে অপরূপ রূপে দেখেছেন বিশ্বকে। তাঁদের দৃষ্টিতে সবই মধু—সবই অমৃত! ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত প্রতি ধূলায় অসীম আনন্দ। তাঁদের প্রার্থনা.....

মধু নক্ত মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা॥

আমাদের স্বামীজীর প্রার্থনাও তো— সংসার হোক মধু-বৃন্দাবন, বিশ্বের অঙ্গন হোক শ্রীবৈকুণ্ঠ, ধরার ধূলি হোক মধুময় ব্রহ্মপুরি। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ঋষি প্রসঙ্গে বলেন: "The love which drives our hate is a divine quality of which only one man in a thousand is capable. A saint full of love for all mankind possesses it a Philanthropist consumed with a desire to heal the miseries of the race possesses it." জীব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এঁরা; তাঁরা এক বিশ্ব-প্রেমিক। সে দিক দিয়েও দেখা যায় স্বামী এর আমরণ মানবের দুঃখ মোচনের জন্য কি কাতরতা, বুক ভাঙা কি কান্না! দেশ জুড়া সমাজের বুকে আনন্দের শতদল ফোটানর তাঁর কি একনিষ্ঠ

পতিতাদের অমৃত পথে আনার জন্য তাদের আলয়ে গিয়ে করেন ভাগবত পাঠ। বৃন্দাবনে ভেবে, মুচীদের কূপ থেকে জল আনার অধিকার। পুলিন প্রমুখ কত জনের জীবনকে করেন সঞ্জীবিত। বিলাসব্যসনিনী কুলবধূকেও আবার কূলের কিনারে ফিরিয়ে আনেন। আজীবন মনের দীপ জ্বেলে মানুষের অনন্ত দুঃখের অন্ধকারকে অপসৃত করার তাঁর কি সহজ প্রয়াস!

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়॥

উপনিষদের এ বাণীর তিনি যেন প্রকৃত রূপকার। তাই তো তাঁকে মনের মণিকোঠায় মুনির আসনে না বসিয়ে আমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না।

প্রাচীন ঋষিরা ছিল ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। ক্লীবত্বকে তাঁরা তাঁদের প্রাণে কোন দিন স্থান দেননি। গাধিনন্দন মহাক্ষত্রিয় আসেন বশিষ্ঠাশ্রমে। সবলা কামধেনুর দ্বারা পাতিত্যে বিস্মিত হন বিশ্বামিত্র। বাহুবলে অধিকার করতে চান তিনি। বশিষ্ঠের ইচ্ছায় সবলার অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় অজস্র সৈন্য। পরাজয়ের গ্লানি মেখে মহাদেবের তপস্যায় ব্রতী হন গাধিনন্দন। শিব-বরে বলীয়ান হয়ে আসেন আবার আশ্রমে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে তপোবনে আগে বিভীষিকা। কিন্তু ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়। শুক্ল যজুর্বেদে তাই তো উচ্চারিত হয়— তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি

আমাদের অবধূত মহারাজ তো জাতির জন্য তেজ, বীর্য, বল বার বার প্রার্থনা করেন তাঁর বাণী— "দর্শ ভুলনা; সাধন পন্থাই আজ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়ে মানুষের তেজ, বীর্য হরণ ক'রে ক্লীবত্ব প্রদান করছে। ক্লীবত্বের আচরণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে।" বাণী থেকে প্রবাহ তাঁর জীবনে যাই – রহা – মজ্জিত বাংলা। রাজ-শক্তির প্রবল প্রতাপে অর্জরিত বাঙালী। সেদিনে

...দের বিরুদ্ধে আমাদের স্বামীজির কণ্ঠ তখন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। তাঁর অগ্নি বীণার ঝঙ্কারে ঘুমন্ত সিংহ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাইতো বলতে ইচ্ছে হয়—

তোমার সুত তোমা শিখার দীপ্ত সেদিন দেশ ও জাতি
ভিমির ভেঙে ছোটে ভাস্কর তেমতাতি
জাগে সোলা সবার প্রাণে
মুখর মানবের অভ্যুদয়ে
অবাক্ হিয়া ভাবে একি আসে যেন অমার রাতি!

বরিশালের বুকে শরৎ কুমার সেদিন যেন এক আগ্নেয়গিরি। তার নিস্তব্ধ লাভার দাহে সারা পূর্ববঙ্গ পরিব্যাপ্ত পুরুষোত্তমানন্দের কণ্ঠে বুঝি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। সে ডাকে জাহাজের কুলী, খালাসীরা পর্যন্ত তাঁর ছত্র ছায়ায় এসে সমবেত হয়। তাঁর বহ্নি বাণীতে শিহোড়-পুরের জননীরা তাঁদের তরোয়ালটি নন্দনকে চন্দন মালো সজ্জিত ক'রে আদালত প্রাঙ্গনে পাঠিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ ঋষির উক্তেজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের বাণী মনে পড়ে— "He bade us leave the Canine method of agitation for the Iconine— and preached the gospel of fearless strength and force." মহাযোগীর বাণী ঐ কথাগুলি আমাদের স্বামীজির কণ্ঠে পরিয়ে বলি— 'লসতু লসতু কণ্ঠে মহু মন্ত্রার মালা'।

আশ্চর্য্য উদার, অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন ভারত তপোবনের ঋষিবৃন্দ। তাঁরা তপস্বীরা মিথ্যা মরীচিকায় কোন দিন পা বাড়ান-নি। তাঁদের মুখনিঃসৃত চলিত বাণী— 'সত্যং বদ। ধর্মং চর। ... সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।' এই ক'টি কথা বিচার করলেও দেখা যায় আমাদের স্বামীজি যেন সত্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। কিশোর কুমার শরৎ কুমারের বয়স তখন ৬ কিংবা ৭ বৎসর। সে সময় তাঁর জনক অনেক প্রলোভনীয় সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়েন পুত্রকে 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার' জন্য নানা লোভন চাপ কিন্তু সত্যের পূজারী শরৎকুমার মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হন না। আবার পরবর্ত্তী জীবনে যখন ব্রজ মোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সে সময় অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ অসত্যের পথে ধাবিত, তখন পূতপ্রাণ অধ্যক্ষ মহারাজ সে বাণীর দেউল পরিত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মধ্যে মিথ্যার বেসাতি দেখে তিনি সে সংস্রবও ত্যাগ করেন। এবার আমি যদি স্বামীজিকে উপনিষদের ঋষি আখ্যা দিই তবে কি 'পরিত্যামুৎসহাস্তাম্'?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে জানিয়েছেন

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্চাক্রিয়ঃ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পুরুষোত্তম প্রেরণাতেই সকল কর্ম্ম করে থাকতেন। কর্ম্মফলের আশ্রিত তিনি কখন হননি। ঐ বাগুইআটি গ্রামে যখন স্বামীজির আশ্রম গড়ার সাধ জাগে তখন অনেকে বলেন — "পাবন-বর্জ্জিত এ স্থান, ভক্ত-জীবন যাপনের পরিবেশ এখানে নাই।" তাতে স্বামীজি জানান - "পুরুষোত্তম প্রেরণাতেই এখানে এসেছি—নিশ্চয়ই ভক্ত ভগবানের মিলন তীর্থ এখানে সৃষ্টি হবে" তাই হচ্ছেও তাই। সেই সাহারার মাটি বাগুইআটিতে তিনি বয়ে এনেছেন আজ অলকানন্দা। সুতরাং ভগবানের ভাষাতেই প্রমাণিত হয় আমাদের স্বামীজি

সন্ন্যাসী, যোগী, ঋষি।

তপস্বীরা হন ত্রিকালজ্ঞ। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতের দৃশ্য তাঁদের নয়নে ভেসে ওঠে। আমাদের অবধূত মহারাজের অন্তর দৃষ্টির রাজপথে আগামী পৃথিবীর সব কিছু আভাসিত হয়। বর্তমানের বস্তুসর্বস্ব বন্ধার প্লাবন ক্রান্তদর্শী ঋষির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি বলেন "প্রকৃতকে বিশ্বেশ্বরের কিংবা বিশ্বের সেবায় না লাগিয়ে 'মনের ভোগে লাগাবার জন্য মানুষ যখন বদ্ধপরিকর হয় তখন সে প্রকৃতির উপর বাপ বল প্রয়োগ করে। সে প্রকৃতিকে অধীনী বানাতেই চায়, প্রকৃতি দীর্ঘকাল তার কম জোটায় না, তার রুদ্রাণী মূর্তি একদিন সকল বিজ্ঞানকে ছেড়ে চুড়ে একাকার করে দেয়"। পুজার প্রাকলগ্নে পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে যে বাঁধ – ভাঙা জলোচ্ছ্বাস তাকি স্বামীজির ভবিষ্যত বাণী নয়? এখন তাঁকে ঋষিপদে ভূষিত করা কি আমার অত্যুক্তি?

এ প্রসঙ্গে কলিকাতার নারিকেলডাঙা নিবাসী উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অবধূত মহারাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উক্তি উদ্ধৃত করি – "সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে আমরা একটি সাধককে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহার নাম শরৎকুমার ঘোষ .....তিনি বাংলার প্রতি ঘরে ৭ কোটি নরনারীর, ভ্রাতাভগিনীর নিকট সর্বকল্যাণকারী বেদান্তের নূতন তত্ত্ব শুনাইবার সঞ্জীবনী মন্ত্র লইয়া এই বিরাট শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছেন। বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আগের ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

আমার অনুভূতির আয়নায় অবধূত মহারাজ যে ভাবে প্রতিবিম্বিত হলেন সেইভাবেই চিত্রিত করিলাম মুর্শিদাবাদের বাউল কবি আমি এবার একটু প্রাণের একতারা বাজিয়ে বিদায় নিই —

তুমি তপস্বী সত্যই ঋষি যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি;
জ্ঞান বারিধির মসি বারি রাশি করেছে অমৃত সৃষ্টি।
আসি আজ এই উষ্ণ অঞ্চনে
শুভ্র কুসুম অঞ্জলি চরণে
মহারাজ! মধু বিভূতি ছড়ায়ে কর না আশিস বৃষ্টি।

বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দ

—শ্রীরেণুমিত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯৮-তম জন্মকে স্মরণ করে আজ আমরা সমবেত হয়েছি। তাঁকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি, এই সঙ্গেই তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপাল—যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত-কে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করি। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের এই জন্মক্ষণে তাঁর জীবন ও জীবন-দর্শন মানুষের বহুবিধ সংস্কার সমাধানে কি ভাবে সাহায্য করতে পারে তাই আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রকৃতির হাতে যে মার আমরা খাই তার চেয়ে কঠিনতম মার খায় মানুষ মানুষেরই হাতে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা মানুষের এই শোষণের বিরুদ্ধে স্বামীজী দাঁড়িয়েছিলেন: যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন vested interest যেখানে শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বামীজী তার প্রতিবাদ করেছেন। ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমতঃ বরিশাল তথা বাঙলার শত শত গ্রাম ও সহর, বৃন্দাবন এবং সেখান থেকে সুরাট বরোদা আহমেদাবাদ পেটলাদ প্রভৃতি স্থানে সমাজের নিম্নতম ব্যক্তিটির সঙ্গেও মিশে সমগ্র সমাজকে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য আত্মসচেতন করে তুলতে প্রয়াস করে গেছেন। স্বামীজী কখনও রাজনীতির জন্য রাজনীতি করেন নি। সারা জীবন তিনি মানুষকে কর্মে ধ্যানে ভক্তিতে প্রেমে সামগ্রিক মানুষ হতেই উদ্বোধিত করে গেছেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সত্য প্রেম পবিত্রতার পথে শোষণের প্রতিবাদ আছে বুঝে মাতৃভূমি বরিশালে ফিরে আন্দোলনে যোগদান করলেন। তখন তিনি কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যও ছিলেন না। তথাপি কারো আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে সদলবলে লবন আইন অমান্য করেছিলেন ৮০ মাইল যাওয়ার পর গ্রেপ্তার হন। ১৪ জনের এই দলে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুপত্নী প্রভৃতি ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে ১৯১০, ১৯৩০ ও ১৯৪২-এ তিন বার স্বামীজী কারাবরণ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামীজী বিভিন্ন কারণে অনেকবার উপোস করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা যায় সবশুদ্ধ সাতবারে ১১৩ দিন উপোস করেছিলেন।

১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁর শিক্ষকতা-কর্ম চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে শ্রীশ্রীনিতাগোপালদেবের জীবন ও দর্শন অবলম্বন করে বেদান্তের এক যুগান্তকারী ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর বেদান্তের নূতন রূপ সম্বন্ধে অবহিত ও চমৎকৃত হয়ে প্রসিদ্ধ থিয়োসফিষ্ট মনীষী হীরেন দত্ত কলিকাতা থিয়োসফিকাল সোসাইটিতে ১৯১৯-এর মার্চ এপ্রিল মে মাসে একসঙ্গে ৯ম রবিবার তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। হীরেন দত্ত সেই সময় স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'He has a life, he has a call of the life, he feels the life'। বেদান্তের এই নূতন ভাষ্যে জীবন ও তারীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে যে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি তিনি পরিবেশন করেছেন, তাতে রয়েছে সর্বক্ষেত্রে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মন্থন, কারো নিরাকরণ নেই। সংক্ষেপে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—বৃদ্ধ মতবাদ ও শঙ্কর মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত হিসাবেই চিরদিন পরিলক্ষিত হয়েছে, কেউ কাউকে স্বীকার করেন নি, প্রত্যেকে অপরকে অস্বীকার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রত্যেকের বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে প্রত্যেকটী মতবাদের যৌক্তিকতা ও সত্যতা স্বীকার করে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি মতবাদ বিশেষ হিসাবে সত্য হলেও অপর সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক মহা দার্শনিক রাসমণ্ডল তৈরী করতে সম্ভবপর

হলেই সে পরিপূর্ণ সত্তা হয়ে উঠতে পারে— অপরকে অভিভূত বা নিষ্ক্রিয় করে সে একক সম্পূর্ণ সত্তা নয়। অপর সকলকে নিয়ে আমি সত্তা এ মানসিকতা সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-ক্ষেত্রে আনতে পারলে সমাজ-জীবনে অনেক ক্লেদ থেকে রক্ষা পায়। চারদিকে তাকালে দেখতে পাব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকৃতিতে সমষ্টি-বোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে সত্তার এক অর্ধেক নিয়েই আমরা চলছি, আর তাই তো ব্যক্তি ও দলের অশান্তি সমস্ত সমাজকে বিষিয়ে তুলেছে। ব্যক্তি বা দল-স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্তা তেমনি সকলে মিলে মিশে এক ব্যাপকতর গভীরতর সমষ্টি-বোধ ছাড়া যে সত্তা মানুষের সমাজ টিকতে পারে না এ কথাও তেমনই সত্য। তাই সকলের হাত ধরাধরিদ্বারা এক মহা রাস-মণ্ডলে মিলিত হওয়ার চিন্তাধারার আজ প্রয়োজন আছে। শ্রীমৎ স্বামীজী সেই পথ-রেখা এঁকে রেখে গেছেন।

শ্রীমৎ স্বামীজীর বৈপ্লবিক দর্শনের অপর একটি বিশেষ দিক হল প্রচলিত বর্ণাশ্রম ভিত্তিধারার বর্ণভেদ প্রথা তথা ছোট বড় ভেদ উপাদেয়ত্ব সিদ্ধিতত্ত্ব ক না মানা এবং এই না-মানার শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক যুক্তি প্রদান। এই বর্ণভেদের কঠিন কাঠামো ভারতবর্ষে অনেক নূতনতর জীবন-বোধকে ঠেকিয়ে রেখেছে — দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এ কথাটা পণ্ডিত প্রবর শ্রীঅমান দত্ত মশাই তাঁর 'বাক্তি যুক্তি সমাজ' নামক বইতে সুন্দর উপস্থিত করেছেন। তিনি লিখছেন, 'আমাদের ইতিহাসে এই রকম (অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথার ওপর আঘাত হিন্দু সমাজের সৃষ্টি না করা) বার-বারই হয়েছে। বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। বুদ্ধ থেকে মার্ক্স অবধি এ নরকের ভাকেই মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারপর বিশাল সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বিদ্রোহীরা ধীরে ধীরে নেমে এসেছেন নব লব্ধ সত্তার ঊর্দ্ধলোক থেকে প্রচলিত আচারের কঠিন মাটিতে। বিদ্রোহী মন্ত্র বা আওয়াজ ত্যাগ না করেও তাঁরা জীবনের আচরণে আপোস করে নিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে'। এইখানে স্বামীজী ব্যতিক্রম। তিনি রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপোষ করেন নি। বর্ণভেদের শক্ত কাঠামো ভাঙা আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি এই কারণেই যে, বর্ণভেদ যে গুণ-ভেদের উপর দাঁড়ানো, সে গুণ-ভেদ কেউ দূর করে নেন নি। বর্ণভেদ তখনই দূর হতে পারে যখন সত্ত্ব রজো তমো এই তিন গুণের মধ্যে কেন উপাদেয়ত্ব বা উচ্চ নীচত্ব দূর করতে পারি। শ্রীশ্রীনিতাগোপালের জীবন-দর্শন অবলম্বন করে শ্রীমৎ স্বামীজী ভারতীয় প্রজ্ঞানস্তরের যে ভাষ্য রচনা করেছেন তাতে প্রতিটি গুণ জীবনের মধ্যে সমান সত্তা অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে নিজের নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে — তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ অর্থাৎ ছোট বড় বিভাগ করা যেতে পারে না এবং উচ্চতম জীবন-বোধ তথা ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রতিটী গুণের সম মূল্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। প্রতিটী গুণকে এই ভাবে সম-মূল্যে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেই শুধু ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের সর্বাপেক্ষা কলঙ্ক অস্পৃশ্যতা বা উচ্চনীচ ভেদ বোধ দূর করবার পথ পাওয়া যাবে। শুধু আইনের সাহায্যে বা তাদের পৃথক করে রেখে কেবল কতকগুলি সুবিধা দিলেই এ কলঙ্ক

মূল্যীকরণ সম্ভব নয়।

শ্রীমৎ স্বামীজীর এই বৈপ্লবিক দর্শন তিনি তাঁর রচিত তাত্ত্বিক গ্রন্থানত্রয়ে রক্ষা করে গেছেন। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য লিখেছিলেন ১৯২৯-এ, ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন ১১ খানা প্রধান উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেন। এ ছাড়া শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-দর্শনে ও জীবনে বলে একখানি বই এবং গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম - পদ্ধতির উপর একখানি বই রচনা করেছেন ভারতীয় গ্রন্থানত্রয়ের এই যুগোপযোগী ভাষ্য বর্ণাশ্রমের উচ্চ নীচ ভেদবাদের মূলোচ্ছেদের শাস্ত্রগর্ভ চিন্তাধারা যেমন দিয়েছে, তেমনি বর্তমান কালের প্রগতিশীল জীবনধারা যেখানে স্থিতিশীল, জড় - অজড় প্রভৃতি বিরুদ্ধের মিলন রয়েছে সেখানেও পথ দেখাবে।

শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁর শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসার পর থেকে একক জীবন বা ব্যক্তিগত জীবন - বোধের সঙ্গে সঙ্ঘ চেতনাকে এমন একাত্ম করে পেয়েছিলেন যে রাজনীতির কৃচ্ছ্রতার দিন-গুলিতেও তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন এবং সন্ন্যাস - জীবনেও তাঁর সামগ্রিক সমন্বয়ের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ দিতে তাঁর ব্যক্তি - জীবনের কোন সম্পর্ক তো অস্বীকার করেনই নি, যতদূর সম্ভব সকলকে সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে নিয়ে চলেছেন, যেখানে ও যখন সেটা সম্ভব হয় নি, সেখানে ও তখন তিনি তাঁর আদর্শের পথে এগিয়ে এসেছেন। এই সঙ্ঘ - চেতনার প্রেরণায় প্রথম থেকেই তিনি নানারকম সমিতি বা 'সঙ্ঘ' গড়ে নিয়ে জীবন - পথে চলেছেন। তাঁর কলেজ জীবনেই গড়েছিলেন 'সত্যব্রত সমিতি'—সেখানের আদর্শের মধ্যে লেখা ছিল—'বিষয়েষু সচ্চিদানন্দং দৃষ্ট্বা সুখী ভব ভবে'— বিষয়ের মধ্যে সচ্চিদানন্দকে দেখে এ জগতে সুখী হও। বিষয়কে বিষ বলেন নি — বিষয়ের মধ্যেই সচ্চিদানন্দকে দেখতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে 'বিশ্বকল্যাণ সভা', তার-পর কংগ্রেসে যোগদান, এরপর 'আনন্দমঠ', এরপর কংগ্রেসের ছুনীতিতে সেখানে থাকতে মন চাইল না বলে 'স্বরাজ - সেবক - সঙ্ঘ' গড়ে-ছিলেন। এরপর গৌরাঙ্গ - গোষ্ঠী, তারপর নর-নারায়ণ আশ্রম। এই নরনারায়ণ আশ্রম নিয়ে ১৯৪৬-র মার্চ মাসে স্বামীজী বাগুইআটি আসেন। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের সেবাপূজাদিসহ স্বামীজীর বৈপ্লবিক দর্শনের পুস্তকগুলি এবং প্রচার - মাধ্যম হিসাবে 'উদ্বোধন' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই সঙ্গে দুইটি শিশু - বিদ্যালয়, একটী গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও একটি মহিলা শিল্প - শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়। ১৯৭৮-র মার্চের শেষে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের সমাধি-ক্ষেত্র কলিকাতার বাগবাজারে অবস্থিত মহানির্বাণ-মঠে তাঁর অনুরাগিকদের তিন দিন বক্তৃতা প্রদান অন্তে তৃতীয় দিনে স্বামীজী অজ্ঞান হয়ে যান, একদিন পি জি হাসপাতালে ঐ অবস্থায় থেকে ১৯৭৮-র ১লা এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। তাঁর পূণ্য দেহ এই নরনারায়ণ আশ্রমে সমাহিত আছে। গত ১২ বৎসর নরনারায়ণ আশ্রম তাঁর সাধ্যমত তাঁর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা স্বামীর মানুষের প্রাণের স্পর্শ প্রার্থনা করি।

শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁর সারা জীবনে রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ে ১৫ হাজার বক্তৃতা দিয়েছেন বলা যায়। তাঁর বাগ্মীতা এমন মনোমুগ্ধকর ছিল

যে বিনা দ্বিধায় হাজার হাজার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে তাঁর ভাষণ শুনত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এতই সাময়িক ছিল যে, যা ভালবেসে শুনত, অভ্যস্ত নূতন হয়ে পড়ার দরুণ তা মনে রাখতে পারত না। কিন্তু শ্রীমৎ স্বামীজীর সংস্পর্শে যখন যারা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে কখনও ভুলে যেতে পারেন না। স্বামীজী চলায় ফেরায় অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষায় 'ছেঁড়া মাদুর' শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র পরম ঐশ্বর্য ছিল — সে তাঁর প্রাণ। একদিনের জন্যও যাকে আপন মনে করবার ঘটনা ঘটেছে, সারা জীবন তার সাথে প্রাণের সে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন — ঘরে বাইরে ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে শুধু প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাই নয়, প্রত্যেককে তাঁর সবটুকু শুদ্ধ, তাঁর আত্মীয় পরিজন পরিবেশশুদ্ধ ভালবাসতেন। সকলেরই তিনি ছিলেন আপন জন, বান্ধব। তাঁর প্রাণের এই ঐশ্বর্য অদ্ভুত, অপূর্ব অনির্বাচনীয়। তাই তিনি তিনি যেমন মহান, তেমনি মধুর।

পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবন-সাধনা

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়

প্রতি মহাপুরুষেরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জীবন-সাধনা, ধ্যান ধারণা অবশ্যই থাকে। আর তার মধ্য দিয়েই তাঁরা অমরত্ব লাভ করে থাকেন। যীশু, মহম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ সাধক বৃন্দ আজও তাদের ভাব - ধারার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। আর পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকবে তাঁরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকবেন এটাই ঐতিহাসিক সত্য। একটি মানুষ অপর একটি মানুষের মত হুবহু এক না — কি চিন্তায়, কি দৈহিক কাঠামোয়, কি মানসিকতায়— এটাই প্রকৃতির বা ঈশ্বরের মহিমা! মানুষের এই বৈচিত্র্যের জন্যই ভগবানকে যুগে যুগে অবতরণ করতে হয়েছে দেশে দেশে, যুগে যুগে। একা যীশু, মহম্মদ, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের দ্বারা সমস্ত বিশ্বের মানুষের মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়— উচিতও নয়। কাজেই ছোট বড় পরিচিত অপরিচিত মহামানবদেরও বিশ্বের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনেই তাঁরা আসেন আবার চলে যান বা তিরোহিত হন। এই ভাবেই চলেছে অনন্ত লীলা।

শ্রীনিতাইগোপাল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দও এসেছেন এই দুঃখ - বেদনা, জর্জর ধরণীর বুকে এক নতুন জীবন - সাধনা নিয়ে, যে জীবন-সাধনা কঠিন—অথচ প্রাত্যহিক জীবনে বা আধুনিক জীবন - চর্চার অনুকূল। সমাজ ভেঙে গেছে; ধর্মের প্রতি বর্তমান যুব সমাজের যে অনীহা ভাব এর মূল কারণ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ। মানুষ বাস্তবকে ক্রমশঃ ভালবাসতে শিখছে। মানুষের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়েই তাঁরা চিন্তা করেছেন বেশী। আকাশের ভগবানের

প্রতি মানুষের ধ্যান ধারণার ঘটছে পরিবর্তন। ক্ষেত্রেই সাধন ভজনের পরিবর্তন অনিবার্য। কতকগুলি ভেক জিনিস নিয়ে জীবন চলে না, মনেও প্রশান্তি আসে না। জীবন বড় বাস্তব। এই বাস্তব জীবন নিয়েই শ্রীনিতাগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সাধনার ক্রমবিকাশ।

শ্রীনিতাগোপাল, পুরুষোত্তমানন্দ চান মানুষের মনের পরিবর্তন। মানুষের মনের পরিবর্তন যদি না হ'ল তবে দীক্ষা দিয়ে কি হবে – এটাই ছিল পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জিজ্ঞাস্য। এই কারণে তাঁর শিষ্য করা বিশেষ সম্ভব হয়নি। শিষ্য করে তাদের থেকে প্রণামী সংগ্রহ করে মঠ মিশন তৈরি সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব তিনি পোষণ করতেন। তিনি মানুষের মনোজগৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মানুষ চায় তার নিজের মত করে সবকিছু :— স্বামী, স্ত্রী, সংসার, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি। অবশ্য এটা মানুষের দোষ নয় — এটা সৃষ্টি - কর্মের বৈশিষ্ট্য। আর এর ফলেই পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি। তবে এর ফলে মানুষের মধ্যে যেমন পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে মানুষ লাভও করেছে বিস্তর। জড়-চৈতন্যের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দেহ। আলো - অন্ধকারের মধুর মিশ্রণে অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। অপর দিকে ভেদাভেদের মধ্য মত - পার্থক্যের জন্য মানুষ আত্ম - হননও কম করে নি। এই আলো আঁধারের গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে কি ভাবে এক দিব্য অথচ সহজ জীবন গড়ে উঠতে পারে তাই সাধনা দিয়েছেন শ্রীনিতাগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ।

পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবনের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা আমরা দেখেছি। মানুষ কি ভাবে ভাগবতী তনু লাভ করে এই ধূলি মলিন ধরণীতে লীলার হিল্লোলে দুলতে দুলতে জন্ম কালের ঘেরা ছুটে যেতে পারে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন পুরুষোত্তমানন্দ পুরুষোত্তমানন্দের সাধন ভজনের মূল কেন্দ্রভূমি ছিল তাঁর জীবন - দেবতা শ্রীনিতাগোপাল। শ্রীনিতাগোপাল ছিলেন সার্বজনীন, বিশ্বনাগরিক। সমস্ত দিব্যভাব, দিব্যকর্ম তাঁর মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল। কোন ঐকদেশিক মনোভাব তাঁর মধ্যে বা তাঁর জীবন - চর্চার মধ্যে ছিল না। তিনি পরম প্রেমিক ছিলেন আপামর সমস্ত শ্রেণীর মানুষ থেকে উত্তর জীবের উপরও তাঁর অপরিসীম করুণা ও ভালবাসা ছিল এই ভালবাসা ছিল আকাশের মত বিস্তৃত, সমুদ্রের মত গভীর। পুরুষোত্তমানন্দ এই মানুষটিকে জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই মানুষটির ধ্যানে বিভোর ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই তাঁরও জীবন - সাধনার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল ভালবাসা। ভালবাসা ছাড়া মানুষের জীবনের পরম কল্যাণ লাভ হয় না। তিনি প্রায়ই বলতেন 'পরশ নইলে হাজার কইলে -ভাক তবে বলে বলে'—যার পরশ পাই নি, যাকে দেখি নি, তাকে ভালবাসা বড় কঠিন। আর তার মধ্যে ভুল ভ্রান্তিও থাকে বেশী। তাই তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের উপর জোর দিয়েছিলেন বেশী। প্রত্যক্ষ ভাবে একদিন ব্রজের গোপকুল-বধূগণ পরম পতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা।

কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যমুনার জলে জলকেলিতেও তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন ভাবে ব্রজগোপীরা প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতেন তাঁরা নিজের দেহকে কৃষ্ণের দেহ বলে অনুভব করতেন কাজেই তাঁদের জীবনে আলাদা করে অন্য কোন ধ্যান ধারণা মালাজপ ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান সময়ে পুরুষোত্তমানন্দ এই ব্রজের সাধনাই বলবার জন্য এসেছেন। তিনি তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীনিতাগোপালদেবকে তাঁর নিজের অস্তি, মজ্জা বলে মনে করতেন। আর তাঁরই কথা, কাজ তিনি সারা জীবন ধরে করে গেলেন। তাঁর জীবনে পরিবারের কাজ, সমাজের কাজ, রাষ্ট্রের কাজ সবই তাঁর গুরুর কাজ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলতেন জীবনকে বাদ দিয়ে সাধনা নয়, সংসারকে বাদ দিয়ে সাধনা নয়। সাধনা থাকবে মানুষের মনে, প্রাণে জীবনে। একটি মানুষ সাধু কি অসাধু এর বিচার সহজে করা সম্ভব নয়। একই কাজ করে একটি মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে আবার সেই একই কাজ করে অপর একটি মানুষ পরম মুক্তির স্বাদ পেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে যিনি কাজটি করছেন তাঁর মনোভাবের উপর। স্বামীজী রামপ্রসাদের একটি প্রিয় গানের কলি প্রায়ই শোনাতেন, আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মায়েরে, নগর প্রদক্ষিণ করি মনে করি প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মায়েরে। রামপ্রসাদ এই যে ভাবে সাধনা করতেন এই সাধনা জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। সারা দিন অপকর্ম আর রাতে মালা জপ—এ জীবনকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পুরুষোত্তমানন্দের শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁর জীবন-দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে একটা নতুন মানুষের দল—যে মানুষ হবে সরল সহজ সচ্ছল গতিময় আর অবিচল নিষ্ঠাযুক্ত, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে থাকবে তাদের অব্যাহত অনুপ্রবেশ যে মানুষ হবে সমাজের পরিবারের রাষ্ট্রের নিয়ন্তা। কিন্তু সে মানুষ তিনি পান নি। এই না পাওয়ার বেদনায় তিনি শেষের দিকে বড় আকুল হয়েছিলেন তাঁর কাছে অনেক মানুষ এসেছে দীক্ষা নেবার জন্য, সন্ন্যাস নেবার জন্য কিন্তু জীবন বদলের দীক্ষা নিতে কেউ আসত না। তিনি যখন মানুষের জীবনের দিবা রূপান্তর ঘটাতে চাইতেন, বুকের মধ্যে নিয়ে নিবিড় ভাবে চোখের জলের মধ্যদিয়ে নিজের জীবনের উত্তাপ দিয়ে মানুষকে মানুষ করতে চাইতেন, আমরা 'একে একে নিভিছে দেউটি'। এই জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথে চলমান পথিক অতি বিরল। তবে আমার দিনে দিনে এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে, শ্রীনিতাগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ ভাবীকালের বন্ধু-বিক্ষুব্ধ মানব গোষ্ঠীকে পথ দেখাবেন। পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন-সাধনা ব্যর্থ হবে না।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯২৬

বিধান পল্লী হইতে একেবারে দাঁড়াইয়া আসিতে হইয়াছে। অথচ বাসে যুবকের সংখ্যা কম ছিল না। যুবকদের সৌজন্য বলিয়া কিছু নাই। মাঝে মাঝে ১/১টি পাওয়া যায় যাহারা নিজেরা দাঁড়াইয়া বসিতে বলে। শরীরটা ক্লান্ত হইয়াছিল সুধীর দাশগুপ্ত (স্কটিশ চার্চের অধ্যাপক) কাল রাত্রিতে হঠাৎ মারা গিয়াছে তাহার স্ত্রীলোক একটু কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সন্তোষ শাস্ত্রী ১বেলা আসে। রেণু বাহির হয় নাই। ১৪ই মার্চ

যাহা কিছু লইয়া মানুষ কাড়াকাড়ি মারা-মারি করে — ভাল খাওয়া পরা, ভাল জায়গায় ভাল করিয়া থাকা, সকলের সামনে গিয়া দাঁড়ানো, সকলের আগে নাম জাহির করা — আমি তাহা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ম্যাজিস্ট্রেট সেল-এ থাকিতাম — যদিও সেখানের ডাক্তার আমার জন্য ভাল সেল এ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন 'ভালর দাবীদার অনেক, মন্দের দাবীদার কেহ নাই স্বর্গেই সকলে যাইতে চায়, নরক কেহ চায় না। নরকেই কোন ঠেলাঠেলি না করিয়া আরামে থাকা যায়, সেখানে ভিড় কম পুণ্যাত্মাদেরই। পুরুষোত্তম-দর্শনে যাহা সামনে তাহা পিছনে, যাহা স্বর্গ তাহাই নরক। পিছন তো সামনে হয় ঘুরিয়া গেলেই। হিংস আন্দোলনে আমি পিছনে, অসহযোগে ছিলাম সামনে দুঃখ সহিতে আমার মত কেহ পারিত না। সেখানে আমি প্রথম। প্রতি অবস্থা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেকেই আত্মবিকাশের সুযোগ এই বিশ্বে পায় যদি আন্তরিকতা ও আবেগ থাকে, দায়িত্ব বোধ থাকে, বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলা যায় কেহই বিশ্বে 'আমি প্রথম' বলিতে পারে না পি, সি, রায় বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে গিয়াছেন, আমি সঙ্গীয় লোকদের পিছনে। এক বন্ধু বলিলেন, 'আগাইয়া যান না'। বলিলাম, 'পিছন সামনে হয়'। সামনে পিছনে সবই পুরুষোত্তমের সঙ্গে সম ব্যবধান। ইহা আমি জীবনে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি। ঠেলাঠেলি করিয়া আমাকে আগাইতে হয় নাই, তোষামোদ করিতে হয় নাই। নিত্য তপস্যায় পিছনে থাকি নাই নিত্যগোপাল অসুস্থ হইল। রেণু অমরেশের বাসায় যায়, ছেলে পাঠাইয়া দেয় নিবার জন্য। সেখান হইতে খাইয়া আসে। খগেন ঘোষের ওখানে যায়। এক ভদ্রলোক ৪৫ টাকা আশ্রমকে দেন। গাঙ্গুলী ৫০ টাকার চেক দেয়। সন্তোষ শাস্ত্রী আসে। ভটস্থ হইয়া বিচার করিয়া দেখিলাম, বর্তমান যুগে নিত্যগোপালের মত 'সহজ'—রূপে গুণে—দ্বিতীয় কেহ নাই। আমি নিত্যগোপালেরও মিথ্যা ভাবক নই। তিনি শব্দের, সকল সম্পর্কের, নরনারীর, কর্ম - জ্ঞান - ভক্তির নূতন valuation দিয়া গিয়াছেন। এই বিপ্লব যাতীত

কিছুতেই সমাজ বাঁচিবে না। কিন্তু ভাবের মধ্যে এই বিপ্লব কোথায়? 'অযাচক আশ্রমে-র' মানে হয় কি? যাহার 'প্রয়োজন' আছে, তিনি মুখে চান বা না চান যাচকই বটেন। অযাচক আশ্রমের ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন দেখিলে তাহাদের অযাচকতার নমুনা মিলিবে। এমন করিয়াই মানুষ নিজেকে ও পরকে ঠকায়। রেণু কেরে ৭টার পর। ১৯শে মার্চ।

শ্রীনিতাগোপাল-স্পর্শের পর আমার হৃদয়ে একটা আলো প্রবেশ করিয়া বীর্যের মত সকল দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ আলোই ছিল বুদ্ধির নিধনে। যখনই কোন শাস্ত্রের উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করি, যখনই তাহার সঙ্গে বুদ্ধির মন্থন বা মৈথুন হয়, তখনই সেখানে ঐ আলো সকল দেহভাগ মথিত করিয়া প্রকট হয়, সকল শাস্ত্র এক নূতন অর্থ লইয়া উদ্ভাসিত হয়, আমি কি বুদ্ধি দিয়া কিছু লিখিয়াছি? আমার বুদ্ধি যে স্তরের, সেই স্তরের কেহ বেদান্ত-ভাষ্য লিখিতে সাহসই করিতে পারিবে না, কল্পনা করিতে পারিবে না। সাহস যোগাইয়াছে বুকের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট ঐ আলো। তাই কি বরিশালের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পরেশ চাটী কী বলিয়াছিলেন 'শরৎ ঘোষের মধ্যে মালিক ঢুকিয়াছে'? বেদান্ত ভাষ্য লিখিতে লিখিতে এমন দিন হইয়াছে- বিশেষভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় অধিরোহ অধ্যায় লিখিবার কালে — যখন কোন আলো পাইতাম না। সেখানে শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি 'অথন' করিতেছেন, সেখানে আমার হৃদয় চাহিতেছে সমন্বয় করিতে। কোথায় আলো? একদিন কালী-কলম ফেলিয়া, উপুড় হইয়া প্রার্থনা করিলাম হৃদয় মথন করিয়া 'আলো' ঢালিল। লিখিতে আরম্ভ করিলাম। বুদ্ধি কসরাইয়া কিছু করি নাই সহজ ভাবেই সব আমার জীবনে আসিয়াছে কোনও কিছুতে আমার আতুরিকতার, আবেগের অভাব ছিল না। মিথ্যাচার আমি কিছুর সঙ্গে করি নাই। আমি সব সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। নিতাগোপাল অসুখে পড়িল। রেণু attestation-এর জন্য জমির দলিল লইয়া যায়, শান্তিবাবুর বাড়ী যায়, ফেরে ৩টায়। ....মেঘে এখনও শেষ হয় নাই মঙ্গলবার মধ্যে হইবে, বুধবার যাইবার কথা বলিয়াছেন অমরেশ আসে ১০৷৷ টায়

আমরা লক্ষ্য করছি

"কলম ভোলার নির্দেশাবলী রূপায়ণের জন্য জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে নিরপেক্ষভাবে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে তাঁদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলি সহায়তাদানে এগিয়ে আসছেন, আলাপ - আলোচনার মাধ্যমে ছোটখাটো বহু বিরোধ মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। এই প্রয়াসকে সুদৃঢ় এবং প্রসারিত করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্য এবং সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কামনা করি।"

১২ ডিসেম্বর ১৯৭৮
মহাকরণ, কলিকাতা—১

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গীতাসাহিত্যে মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা হিন্দী ভাষ্য রহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ শঙ্কর, শ্রীধর বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক ভারত ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত অধ্যাত্মপ্রদীপ্ত সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। বৃহত্তর আকারে ও বড় টাইপে নূতন সংস্করণ জ্যাকেটসহ কাপড়ে বাঁধাই ৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সহ ১১·০০ টাকা।

শ্রীগীতার আর্ষ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে "—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	নিত্য পাঠ্য গীতা
সুলভ পকেট গীতা	সদ্যপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা
পত্র গীতা	১·০০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৮·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭৫
কর্মবাণী	২·০০	Soul of India speaks	৭·০০
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ বি টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০	ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার ঋষি	৬·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার বিদুষী	৪·০০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	৬·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৬·৫০	সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত

ব্যবহারিক শব্দকোষ ·00

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। [illegible] প্রায় ৬৯ হাজার

প্রে সি ডে সি লা ই ব্রে রী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No 57-2540 UJJWALBHARAT

···· জাতি কুল শীল যখন মানুষের 'রস' শোষণ করিতেছিল, ছোট জাতি, ছোট কুল, ছোট শীল যখন আত্মবিকাশের পথ পাইতেছিল না, তখন ভাবের সাধনার সঙ্গে রসের সাধনাকে সমন্বিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে রাস-লীলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেই রস-লীলা ও তাহার দর্শনকে শ্রীশ্রীনিতাগোপাল বর্তমান যুগের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ····

—ছোট-র আত্মবিকাশের দর্শন ও পথ পাইবেন নীচের বইগুলিতে।

'ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তর্মুখী, কিন্তু আবেষ্টনের চাপে সে আজ বাহির-অন্তর্মুখী। স্বভাবে অন্তরে বাহিরে সে আজ দুই খন্ড, দ্বন্দ্ব সমাকুল ···।'

—এই দ্বন্দ্ব-সমাধানের দর্শন ও পথ পাইবেন নীচের বইগুলিতে।

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
২। ঈশোপনিষৎ
৩। কেনোপনিষৎ
৪। কঠোপনিষৎ ৫·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ ২·০০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও জীবনে ৫·০০
১০। মহাত্মাজীর গঠন-মূলক কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৫·০০
(গান্ধী আরুকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১১। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। নূতন বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

3 1979

॥ শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের ॥

১। নারী প্রগতির ভ্রমকথা ৩·০০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য এক শিষ্যা নিত্যগোপাল চক্রবর্তী ও তাহার কথা ৩·০০
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৫·০০

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

১। পরমপুরুষ শ্রীনিতাগোপাল ২·০০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ১·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন ৫·০০
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
৪। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নবনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, (তাম্র—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা ৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে. বি. লাইব্রেরী) হাওড়া হইতে মুদ্রিত।